"I remember, I remember
The fir-tress dark and high ;
I used to think their slender tops
Were close against the sky ;
It was a childish ignorance,
But now 'tis little joy
To know I am further off from Heaven
Than when I was a boy."

—**Thomas Hood.**

দূর কিনারে

এই কাহিনীর ঘটনাকাল :

১৯১৩।১৪ সাল।

লেখকের অন্যান্য বই :

দেওয়ান বাড়ি

কত বিনোদিনী

এক মুঠো মাটি

নাজমা বেগম

একাকার

ফটিক! ওরে ও ফটিক! উঠরে ফটিক! মাঠে যাবিনি? ফর্সা হয়ে এলো! উঠ্! উঠ্!

বাইরে হাঁকাহাঁকি শুনে ফটিকের ঘুম গেল ভেঙ্গে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল সে। শীতের শেষরাতের মোলায়েম ঘুম। তপ্ত বিছানা যেন শরীরকে আঁকড়ে ধরে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। মনও খুশি হয়ে বিছানা ছাড়তে চায় না।

কিন্তু ছাড়তেই হবে। কোন উপায় নেই। মাঠ ভরতি ধান। থৈ থৈ করছে। সাঁওতাল মুনিষ লাগানো হয়েছে ধান কাটবার জন্যে। তার ওপর কদিন কর্তা বাড়ি ছাড়া।

হুঁ!—মুখে একটা বিরক্তির আওয়াজ করে কাঁথাটা গা থেকে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল ফটিক। গজ গজ করতে করতে আপন মনে বললে, মাঠ ভরতি ধান পড়ে রইলো আর বাবুর পুণ্যি করবার শখ জাগলো। গঙ্গায় গেলেন ডুব মারতে। মর তুই শালা! ক্ষেত-খামার মাঠ-ধান নিয়ে। ভীমরতি হয়েছে বুড়োর।

গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ফটিক। ডাক দিল, আয়রে নগা! দাওয়ায় উঠে এসো খুড়ো। একটু তামুক তো খাও। এখনো আঁধার কাটেনি। উঠে এসো। উঠে এসো। কনকনে বাতাস যেন হুল ফোটাচ্ছে।

নগেন আর গুপি দাওয়ায় উঠে এলো। তামাক ধরাতে ধরাতে গুপি বললে, আকাশের চেহারা ভালো নয় রে ফটিক। ধান কটা মাঠ থেকে ঘরে তুলতে না পারলে আর সোয়াস্তি নেই।

—বুড়ো শালা না মরলে আর আমার সোয়াস্তি নেই। আমায় না মেরে কি ও শালা মরবে? আর সময় পেলে না তিরথি করবার। আক্কেল, দেখ দেখি। এক হপ্তা ঘর ছাড়া। খামারে ধান, খেতে ধান, আর তুই গেলি গঙ্গা চান করতে। ডুবে মরেতো বাঁচি। আমার হাড়ে বাতাস লাগে।

হেসে উঠলো নগেন আর গুপি একসঙ্গে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গুপি বললে, কোন ভয় নেই রে ফোটকে। খুড়ো আমার অনেককে ডুবিয়েছে। নিজে ডুববে না। পারে তো আবার কারুকে ডুবিয়ে আসবে।

—কি রকম?

—না ফিরলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

ফটিক বললে, মাইরি খুড়ো। পরাণ বেরিয়ে গেল। মাঠের কাজ কি আমার পোষায়?

নগেন বললে, তুই কি কখনো এসব করেছিস? এই তো তোর হাতে খড়ি।

—শিরদাঁড়া তেবড়ে গেল। কোমর কটকট করে সারা রাত। বাউড়ি বাড়ি থেকে কাল রাতে এক পাঁট চোলাই আনিয়ে গলায় ঢেলে তবে ঘুমুই। পচাই তো খেতে পারি না।

নগেন হাসতে হাসতে বললে, তাই এতো ঘুম।

গুপি বললে, ক্রমে সবই অভ্যেস হয়ে যাবে রে বাবা! চাষির ছেলে, মাঠেই আমাদের অন্ন। মাঠে যাওয়া অভ্যেস কর। নইলে বুড়ো মরে গেলে হাড়ে দুব্বো গজাবে ফোটকে। মুনিষ মজুর দিয়ে চাষ হয় না। লাঙ্গলে হাত না পড়লে আবার চাষি কিসের? বেনে বামুনের চাষ আবার চাষ না কি?

—তা সত্যি।

—বুড়ো থাকতে থাকতে আখের গুছিয়ে নে। বাবা-ধম্মরাজের ইচ্ছেয়, বুড়োর পঁচিশ তিরিশ বিঘে জমি। বুড়োকে তোয়াজ করে এই বেলা সব হাতিয়ে নে।

হাসল ফটিক। বললে, আমাকে না দিয়ে আর করবে কি? দেবে কাকে?

জোরে জোরে হুঁকোয় টান দিয়ে উত্তেজিত স্বরে সে বললে, আর জানতে তো তোমাদের বাকি নেই এসব জমি কার। হলো কোত্থেকে?

—তা জানি বৈ কি! নগা না জানুক, আমি তো জানি।

বুক চিতিয়ে গুপি গর্বভরে তাদের মুখপানে তাকালো।

ছেঁড়া কাঁথার মতো আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ঈশান কোণে ভোরের তারাটা মিট মিট করছে। সলতে-পোড়া প্রদীপের মত ধীরে ধীরে নিভে আসছে। পৃথিবীর গায়ে কুয়াশার আঁচল জড়ানো। দিনের আলো আঁচলের আড়ালে জড়সরো। কনকনে শীতের হাওয়ায় গা আদুর করতে পারছে না।

সব আবছা। ঝাপসা ঝাপসা। হিমেল হাওয়ায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে চাষিরা মাঠের দিকে চলেছে। সাঁওতাল কামিনীদের চূর্ণ চূর্ণ হাসির ঢেউ ছিটিয়ে আসছে দূর থেকে।

কাস্তে আর থলি ভরতি তামাকের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে তিনজনে পথে নামলো।

দখিন মাঠের দিকে তিনজনে এগিয়ে চলল। দখিন মাঠই বাকি। আর সব মাঠই সাবার হয়ে গেছে। তুলে পাড়ার সারি সারি কৎবেলের গাছের নিচে দিয়ে যে পথটা সায়েপুকুরের মাঠে গিয়ে মিশেছে সেই পথ ধরেই তারা এগিয়ে চলল।

পুকুর নয়। একটা দিঘি। পুকুরটার নাম বোধ হয় সাহা-

পুকুর। গাঁয়ের লোকে বলে সায়ে পুকুর। মাঠের মাঝে এতবড় পুকুর নিশ্চয়ই চাষের সেঁচের জন্যেই কেউ কাটিয়ে ছিল। অঢেল কালজল থৈ থৈ করছে। চারিদিকে পাহাড়ের মত উঁচু পাড়। পাড়ের কোলে ধান জমি। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য গাঁয়ে মিশেছে। পুকুরের উঁচুপাড়ে দাঁড়িয়ে যে দিকে তাকাও শুধু চোখে পড়বে, ধানক্ষেত। দিগন্ত পর্যন্ত ধান ক্ষেত। ক্ষেত আর ক্ষেত। মাঝে মাঝে মান্ধাতার আমলের বিরাট বটগাছ। মাঠের মাঝে ছায়ার জন্য সে গুলোও বোধ হয় সযত্নে কেউ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সব আমাদের পুণ্যকামী পূর্ব পুরুষদের কীর্তি। উন্মুক্ত মাঠের মাঝে জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ ছিল তখনকার দিনের জনহিতকর কার্য। পরকালের পুণ্যলোভে তারা এ সব করতেন। ইহলোকের নামের লোভে নয়। গ্রামের ধনশ্রী গ্রামের বাইরে। ভিতরে নয়। গ্রামের আসল রূপ এই চোখ জুড়োনো ধানের ক্ষেতে। এর শস্যসম্পদে। এর বনসম্পদে। তাল তমাল আর বাঁশঝাড়ে। এর দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামোচ্ছ্বাসে।

এই মাঠই চাষির বুকের রক্ত। তার লোহার সিন্দুক। তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।

তিনজনে পথে নেমে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চললো। দুলে-পাড়ার ছেলে মেয়েরা শুকনো বাঁশ পাতা জ্বেলে আগুন পোয়াচ্ছে। কেউ কেউ আলু পোড়াচ্ছে সেই আগুনে, প্রাতরাশের আস্বাদনে। নিঃশব্দে তিনজনে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গুপির পেটের নিচে ফটিকের প্রসঙ্গটা থেকে থেকে ঘুলিয়ে উঠছিল: তোমরা তো জানো এসব জমিজমা কার? জানে বইকি গুপি মোড়ল। তার জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু জানলেই তো মুখফুটে বলবার সুযোগ সুবিধা হয় না। আজ সেই সুযোগ পেয়েও মুখ বুজে

থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে এলো। পুরোনো ইতিহাস নূতন করে বলবার জন্যে সেই থেকে সে উসখুস করছিল।

ফুলেপাড়া পার হয়ে, গুপি আর থাকতে পারলে না। সে গোপন কথা বলবার মত চুপি চুপি বললে, সত্যিই তো, এ সব জমি জমা ফোটকের। দখিন মাঠের ঐ শায়ে পুকুরের নামালের এক বন্দে বারো বিঘে জমি তো ভক্ত খুড়ো সেই বছরই পুন্নু আড্যি মশায়ের কাছে খরিদ করলে। সে কথা গাঁয়ের কেনা জানে? ফোটকের বয়স তখন পাঁচ বছরের মত হবে। আড্যি মশায় বলেছিলেন ফোটকের মায়ের দেওয়া টাকা। জমিটা ফোটকের নামেই কেন ভক্ত। তা ভক্তখুড়ো টালবাহানা করে বললে, নাবালকের নামে সম্পত্তি কেনা অনেক লটখটি। আর আমার তো ছেলেপুলে নেই। ও বেঁচে থাকুক। সবই তো ওই পাবে। তখন তোর নতুন ঠাকুর-মা বেঁচে ছিল। আড্যি মশায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আজ নেই। হতে কতোক্ষণ?

ভক্ত খুড়ো 'দূর দূর' করে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। জমিটা নিজের নামেই কিনেছিলো।

ফটিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্লিপ্ত স্বরে বললে, যার নামেই কিনুক, সবই আমার। ও যাবে কোথা?

—তা ঠিক। আর দেবেই বা কাকে? বুড়ো মরলেই তো বাড়িঘর সব ফোটকের।

নগেন আশ্বাস দিল।

গুপি বললে, বাড়ির ঐ চণ্ডিমণ্ডপও তো সেই টাকায়। সেগুনের নক্সা করা খুঁটি সেঙ্গা দিয়ে, তালকাঁড়ির বাতা দিয়ে, খড়িটি করে ঐ চণ্ডিমণ্ডপ তৈরি হলো। দু'খানা লাঙ্গলের চাষ হলো। তেঁতুল তলায় নতুন গোয়াল তৈরি হলো।

নগেন কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে,. অনেক টাকা দিয়েছিল বলো। তা তুমি ওর মাকে দেখেছো গুপি খুড়ো ?

হেসে উঠলো গুপি। তাচ্ছিল্যের কি গর্বের হাসি বলা শক্ত। হাসতে হাসতে বললে, দেখিনি আবার ? চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। সে কী রূপ ? সে রূপের তুলনা হয় না। এ গাঁয়ে কেন, এ তল্লাটে তার জুড়ি মিলবে না। চাষার ঘরে কেন, বেনে কায়েত বামুনের ঘরে ও অমন রূপসী মেয়ে খুঁজে পাবে না। সেই একবার এসেছিল চোৎমাসের গাজন দেখতে। কেউ কি গাঁয়ে থাকতে ঠাঁই দিলে ? রাণী কোটালের ঘরে তেরাত্তির কাটিয়ে ফোটকেকে দেখে চলে গেলো। তীরথে আসবার মত গাঁয়ে এসে এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে গেলো। ঠাকুর দেবতা, বামুন সজ্জনকে ডেকে ডেকে টাকা দিয়েছিল। গাজনের থাকার জন্যে একশো টাকা চাঁদা দিয়ে গেলো।

—হুঁম! একটা বিরক্তিকর আওয়াজ বের হলো ফটিকের গলা থেকে। একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে সে গুপির পানে তাকালো।

গুপি চুপ করলো।

ফটিক বললে, যেন্দাও ও সব কথা। তারপরও গঙ্গা চানের দোহাই দিয়ে কোলকাতা গিয়ে চুপি চুপি অনেক বার বুড়ো টাকা নিয়ে এসেছে হারামজাদির কাছ থেকে। সে সব খবর ও আমি জানি।

সামনের বটগাছের মাথা থেকে এক ঝাঁক টিয়ে পাখি উড়ে গেল ধানক্ষেতের দিকে। ফটিক ওপর পানে চেয়ে বললে, ইস্! ঝাঁক ঝাঁক টিয়ে পাখি এসেছে গাঁয়ে। ধান খেতে। এমন সময় নেই রে নগা যে একটা আটাকাঠি তৈরি করি!

—সবুজ পালকে খামার ভরতি হয়ে গেছে।

ক্ষেতের আলে উঠতেই একটা সাঁওতাল কামীন কলে উঠলো, হাই মোদের ছোটো করতা আইছে। এতোক্ষণে তোর রাত পোয়ালো রে ছোট করতা। আমরা তো মাঠ উজোর করে ফেলনু।

—করবি বই কি। জলখাবারের বেলায় এ জমি সাফ করে ফেলতে হবে। কী রকম পাঁজা হইছে? ক কাহন হলো?

—তা বিঘেয় কাহন হবে গো ছোট করতা। এমন ফলন পাঁচ বছরে হয় নি। এ বছর বিয়া করতে পারবি। আগলে বছরে এসে তোর বউ দেখব। বেটা কোলে নেবো। বিড়ি আনছিস্? দে বিড়ি দে।

আকাশে এখনো সূর্য ওঠেনি। লাল রঙের পোঁচ ধরেছে পূবদিকে। এরি মধ্যে মাঠ সরগরম হয়ে উঠেছে। জোন মুনিষে মাঠ ভরে গেছে। পাকা ধানের মাঝে ডুবে কাস্তে দিয়ে গোছা গোছা ধান কাটছে। মেয়ে মজুররা কাটা ধানের আটি বেঁধে পাইল করছে। মানুষ দেখা যায় না। মাথা দেখা যায় না। দেহ ডুবে আছে ধানের ক্ষেতে। হুমরি খেয়ে মাথা নুয়ে পড়েছে ধানের গোড়ায়। বাঁকা শিরদাঁড়া শুধু কচ্ছপের মত উঁচু হয়ে আছে। কাস্তে চলছে শুকনো ধানের গোড়ায়। শব্দ হচ্ছে ঘ্যাসর ঘ্যাসর। একটানা শব্দ। করাতের শব্দের মত। শীত কেটে গেছে। মুনিষ জনের শরীর তেতে উঠেছে। কালো শরীর চকচক করছে। মাথার চুল দুলছে। হাতের পেশীগুলো ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে উঠছে। শুকনো ধানের পাতায় ক্ষুরের ধার। মুঠিয়ে ধরতে হাত ছড়ে যায়। কেটে রক্ত পড়ে। তবু শান নেই। সাড়া নেই। বেহুঁস হয়ে গেছে নেশার ঘোরে। কাজের নেশা। ভাতের নেশা। এই সোনার শিষে লুকিয়ে আছে সম্বৎসরের ভাত। ভাতই জীবন। জীবনের রস।

দেহের রক্ত। কামনা বাসনা। ভাতের মাঝেই সব। ভাত পেলেই এরা খুশি। ঘরে ভাত থাকলেই জীবনের সব আনন্দ অটুট রইলো।

আলের ওপর থেকে ফটিক হাঁক দিল, হাত চালাও ভাই সব। পেটভরে মদ খাওয়াবো। মদে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়াবো!

এত ধান! বিঘেয় কাঁহন! পণে মণ!

চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে মন ওঠেনা।

ফটিকের মনটা খুশিতে ফুলে ফেঁপে ওঠে। এ সব তার। তারই। তারই জমি। তারি জমির ফসল নিশ্চয়ই তার। বুড়ো হাত বাড়াবে কেমন করে? মনে মনে হাসে ফটিক: বাড়াক না হাত। যে কদিন আছে ভোগ করুক না আমার দৌলতে। তারপর তো সবই আমার একার।

এ সব তার মায়ের দান।

মা! মা! মাকে তার মনে পড়ে না। মায়ের চেহারাটা কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ। ফর্সা তার গায়ের রঙ। বড়ো বড়ো টানা চোখ। অন্ধকারের মত ঢেউ খেলানো মাথাভরা চুল। হাসিভরা দুটি ঠোঁট। সেই ঠোঁট বুলিয়ে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরে দিয়েছে।

তার গাল দুটো হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে। শরীরটা আঁট হয়ে ওঠে ঘৃণায় আর আক্রোশে। হারামজাদি! ছেলে ফেলে যে পালাতে পারে নিজের সুখের জন্যে তার আবার মায়া মমতা! দুর্! দুর্!

মাথা ঝাড়া দিয়ে সে বলে ওঠে, তোরা হাত চালা, আমি একবার শিখির দিঘীর মাঠটা দেখে আসি। হনহন করে সে এগিয়ে গেল শিখির দিঘীর দিকে।

এরা বলে শিখির দিঘী। আসল নামটা বোধ হয় শেঁখের দিঘী।

সেখানেও ক-বিঘে জমি আছে ফটিকের ঠাকুরদা ভক্তর। সেখানেও মুনিষজনে ধান কাটছে।

কিন্তু মাথা ঝাড়া দিলে হবে কি? মাকে মন থেকে কিছুতেই সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। মা যেন তার মনকে হঠাৎ আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। মার কথা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারে না। মা তার মনের মাঝে আথালি পাতালি করছে। মা যেন তাকে ভর করেছে। মা তাকে পেয়ে বসেছে। মা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। লোকের মুখে শুনেছে, মা তাকে কী ভালোই বাসতো। তাইতো গাঁয়ের লোকে সব অবাক হয়ে গেল, যখন তাকে ফেলে তার মা অনায়াসে ঘর ছেড়ে চলে গেল।....গেলি কেমন করে মা?

ফটিকের চোখদুটি হঠাৎ জলে ভরে এলো।

এ হলো কি তার! নিজেরি কেমন আশ্চর্য লাগে। মায়ের জন্য কোনদিন সে চোখের জল ফেলেনি। বরং মার কথা মনে হলেই তার মনে একটা আক্রোশ জাগতো। আজ তার হঠাৎ মনে হলো মাত্র আঠারো বছর বয়সে মা তার বিধবা হয়েছিল। সেই বয়স থেকে সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে পুড়িয়ে, সেই ছাই-এর দিকে তাকিয়ে জীবন কাটানো সহজ নাকি? তার দোষ কি? তার ওপর অতো রূপ? এ তার নিয়তি।

আজ প্রথম মায়ের প্রতি সমবেদনায় তার বুকের নিচেটা টনটন করে উঠলো। মায়ের জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো।

ক্ষেতে ধান কাটতে নেমে সে নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিল। সে শরীরে যেন অসুরের শক্তি পেয়েছে মনে হলো। নতুন তেজ, নতুন উদ্যম তার দেহের রক্তে টগবগ করছে। তার সব চিন্তা

মুছে গেছে। শুধু ক্ষেত আর ধান তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। ক্ষেত আর এখন ক্ষেত নয়। তার প্রাণ। ধান আর ধান নয়। সোনার কুঁচো। এই কুঁচো সোনায় ধামা ভরতি করে সে মরাই বাঁধবে। একটা নয়। অন্তত তিনটে। পাশাপাশি তিনটে মরাই রাজবাড়ির চুড়োর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। উঠোন জ্বল জ্বল করবে। গাঁয়ের আর কোন চাষি পারবে? নিজের খাস জমি। ভাগের জমি নয় যে কেউ ভাগ বসাবে। কারুর জোতদার নয়। সব লাখরাজ জমি। জমিকে আজ প্রাণঢেলে ভালবাসলো ফটিক। মায়ের বুকের ভালবাসার মতো ক্ষেতের এই সোনার ফসল।

আবার সেই মা। মা তাকে ফেলে পালিয়েছে। মা তার সঙ্গে বেইমানি করে তাকে চরণ ছাড়া করেছে। ক্ষেতের মাটি ছুঁয়ে সে মনে মনে বলে তুমিও আমার মাটি। তুমি যেন আমায় ভুলোনা মা। তুমি যেন চরণ ছাড়া করো না। মায়ের সেবা করতে পেলুম না। মাকে ভালোবাসতে পেলুমনা, যেন তোমাকে ভালবেসে তোমার সেবা করে জীবন কাটাতে পারি।

বেলা বেড়েছে। খর তেজে রোদ উঠেছে। শীতের হাওয়ার সঙ্গে তবু পাল্লা দিতে পারে না। রুদ্র তেজে বেরিয়ে এলেও শীতের কনকনে বাতাস লেগে মিইয়ে যায়। মায়ের রাগের মতই ছেলের হাসি দেখে হঠাৎ হাসি হয়ে গলে যায়। মায়ের রাগে-ভেজা মিষ্টি হাসির মত শীতের রোদ তাই এতো মিষ্টি।

জনমুনিষ জমি ছেড়ে ডাঙায় এসে উঠেছে। জলখাবারের ছুটি এখন কিছুক্ষণ। শরীর তো যন্ত্র নয়। সে বিশ্রাম চায়। বিরতি চায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড় ভেঙ্গে ধনুকের মত বাঁকা কোমর সোজা করে নিতে হবে। জিরেন দিয়ে হাতপাগুলোকে সহজ করে নিতে

হবে। পেটে খাবার দিয়ে নিস্তেজ শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে।

রোদে গা মেলে দিয়ে সব মুড়ি চিবুচ্ছে। শ্যামসুন্দর তলার পলা বেনের দোকান থেকে ধামা করে তেলে-ভাজা বেচতে এসেছে। জন মুনিষ আঁচল পেতে বসেছে। ধানকাটার সময় এটা একটা চিরদিনের রেওয়াজ। মাঠে মাঠে তেলে-ভাজা বেগুনি ফুলুরী সরবরাহ করে গাঁয়ের মুদিরা। তার জন্য নগদ পয়সা দিতে হয় না। ধান তোলা হয়ে গেলে বরাদ্দ মত ধান দেবে জমির মালিক।

জলখাওয়া শেষ হলে তামাক ধরিয়ে চাষিরা রোদে বসে জটলা করে। সাঁওতাল মুনিষরা জোড়ে বসে হাসি ঠাট্টা করে। দুটো রসের কথা কয়ে মনটাকে চাঙ্গা করে তোলে। দিনভোর খাটবার মত শরীরে নতুন বলসঞ্চয় করে। যুগলে ভিন্ন সাঁওতাল মুনিষ কাজ করবে না। মাঝিকে নিতে হলে সঙ্গে নিতে হবে তার কামিনীকে। আর এক জমিতে তাদের কাজ দিতে হবে। সামনে ধান কাটবে মাঝি। পেছনে আটি বাঁধবে কামিনী। হাত চলবে দুজনেরি। কাজ করবে দুজনেই। তারি মাঝে জীবনের সাড়া মিলবে। হাসি-ঠাট্টাও চলবে কাজের সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো কোমর দুলিয়ে, ধানের আঁটি ঘুরিয়ে এক পোঁচ নাচ হয়ে যাবে। থেকে থেকে দু এক কলি রসের গান ও হবে। কাজের মাঝেও ওরা জীবনকে ভোলে না। জীবনকে আঁকড়ে ধরেই ওরা কাজের স্রোতে গা ভাসান দেয়। নেশা থাকবে চোখে, খোঁপায় থাকবে ফুল, রঙ থাকবে মনে, কাছে থাকবে মনের মানুষ। তবেই ওরা কাজ করে যাবে।

শীতের হাওয়ায় গায়ে খড়ি ফোটে। গায়ের চামড়া শুকিয়ে চড় চড় করে। কামিনীগুলো বাঁশের চোঙ্ থেকে তেল নিয়ে রোদে বসে গায়ে মুখে তেল মাখে। তেলে ভিজিয়ে গায়ের চামড়া নরম

করে। মুখের চেকনাই বাড়ায়। রোদ তো নয় যেন তপ্ত জলের কুণ্ড। সেই রোদে গা ডুবিয়ে তারা একটা আরাম অনুভব করে। তাদের নিটোল নগ্নশরীরে একটা নতুনতরো দীপ্তি ফুটে ওঠে। রোদের আভায় কালো কাঁচের মত চক চক করে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো।

শিখির দিঘী থেকে শায়েপুকুরের মাঠে ফিরে এসে ফটিক বললে, শিখির দিঘী আজ ও-বেলা শেষ হয়ে যাবে রে নগা। দশকাঠা করে দু-দাগ জমি শেষ করেছি সকাল থেকে। মুনিষগুলো ও-মাঠের খাটিয়ে আছে।

ফটিকের মুখখানা রোদে রাঙা হয়ে উঠেছে। গা তেতে উঠেছে। গায়ের চাদরখানা কোমরে জড়াতে জড়াতে বললে, তামুক ধরা নগা। আমি ও মাঠেই থাকবো। তুই এ মাঠটা দেখিস মুনিষগুলো যেন কাজে আলগা না দেয়। গুপিখুড়ো কম্‌নে গেল?

—ঐ সাঁওতাল মাগিদের সঙ্গে জটলা করছে।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, কাজ বাগাতে হলে একটু আধটু মাগিদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করতে হয়। গুপি খুড়ো কাজ বাগাতে জানে।

—ছোট করতা আইছিস। বিড়ি দে।

দুটো অল্পবয়সী সাঁওতাল মেয়ে হেলে দুলে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। মুখে হাসি। চোখে ঝলকানি।

নগেন বললে, খুব মজার কথা তো। কাজ করবি অন্য লোকের আর বিড়ি জোগাবে ছোট কর্তা। যার মুনিষ তার ঠেঙে বিড়ি নিগে যা।

একটা মেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে চোখ ঘুরিয়ে বললে, তুই কেনে রা করছিস? তোর লাগে তো চাইনি। ছোট করতা মেয়ে মানুষের কদর জানে। তাই উনার কাছে হাত পাতি।

ফটিক হাসলো। হাসতে হাসতে দুজনকে দুটো বিড়ি দিল।

মেয়েটা ভেংচি কেটে নগেনকে বললে, দেখলি ছোটকর্ত্তার দিল। যেমন সোন্দর মরদ তেমনি ওর দিল। তোর মত মরদের কাছে মোরা হাত পাতি না।

চাষির ঘরে ফটিক নিঃসন্দেহ সুন্দর পুরুষ। রোদে পোড়া হলেও ফটিকের দেহের রঙ ফর্শা। সুশ্রী তার দেহের গঠন। মায়ের কাছে পেয়েছে সে দেহের এই সৌকুমার্য।

মেয়েদুটো জড়াজড়ি করে হাসির ঢেউ তুলে চলে গেল।

—ছেনাল মাগিদের ঢঙ দেখেছিস।

ফটিক তাদের পানে লিপ্সাভরা চোখে চেয়ে বললে, দেহ দেখেছিস যেন কালো মাটির চাঙ্গর। সদ্য লাঙ্গল দেওয়া মাটির মতো তপ্ত আর তুলতুলে।

—শালিরা পাঁজার আগুন।

অজানতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফটিক। যৌবনের কামনায় তার মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

নগেন হুঁকোয় টান দেয়।

আলের ওপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গুপি আসছে। মাথা দোলাতে দোলাতে ভারিক্কে চালে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তার মুখখানা যেন আগুনের মত দপদপ করছে।

ফটিক মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি রে নগা। গুপি খুড়ো অমন হন্তে হয়ে আসছে যে?

এক তাল ধোঁয়া ছেড়ে নগেন বললে, কে জানে, দেখ আবার কোথা কি কাণ্ড বাঁধিয়ে এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে গুপি তাদের সামনে এসে বুক বাজিয়ে বললে,

গোনৎকার রে বাবা! গুপি মোড়ল হাত গুনতে জানে। জানে না শুধু কবে সে মরবে। আর সব জানে।

—ব্যাপার কি গুপি খুড়ো?

—পেতঃকালে যে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সে কথা কি রদ হবার জো আছে। গুপির মন এমনি কু গায় না।

—আরে হলো কি?

অধৈর্য হয়ে ফটিক প্রশ্ন করলো।

—হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু। আর তোমার পরকাল শিকেয় উঠলো। বিয়ে করেছে। আবার বিয়ে করে তোর ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়ে বাড়ি আসছে ভক্ত খুড়ো।

হাসল ফটিক: দুর! মিছে কথা!

—মিছে কথা?

আঁট হয়ে মাটিতে বসে, হুঁকোটা নগেনের হাত থেকে ঝটকা দিয়ে কেড়ে নিয়ে, উত্তেজিত স্বরে গুপি বললে, গুপি মোড়ল বেজন্মা নয়। সে তোদের কাছে মিথ্যে বলে বাহাদুরী করে না। বর্ধমানে গাড়ি পাঠাতে হুকুম করেছে আমাকে। পূব পাড়ার ফেমি চাটুয্যে মশায়, আমাদের উমোচরণ উকিলের মুহুরিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। চাটুয্যে মশায় স্বচক্ষে বউ দেখেছে।

ফটিকের মুখ থেকে রক্ত উবে গেছে। পাঙ্গাশ হয়ে গেছে তার মুখখানা। সে হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করে গুপির মুখের পানে চেয়ে রইলো। তার মুখে কথা ফুটলো না।

গুপি বললে, শুধু তাই নয়। মাথা মুড়িয়ে ভেক নিয়েছে ভক্ত খুড়ো। বোষ্টম হয়েছে। মাগি বোধ হয় বোষ্টমী। ভেক নিয়ে তবে স্যাঙ্গা করেছে। চাটুজ্যে মশায় বলছিল, বউটা নাকি ঝরঝরে তকতকে। নিকোনো ঘরের মত। ছিরিছাঁদ আছে। ডবকা।

নগেন জিজ্ঞেস করলে, বয়স কতো হবে ?

—কে আর কঠি ঠিকুজি দেখেছে বলো। তবে বোষ্টমী যখন তখন কোন না ছুচার বার আরো হাতফের হয়েছে ?

নগেন হেসে ফেললে। ফটিকের ও হাসি পেল কিন্তু মুখে তার হাসি ফুটলো না। সে অগাধ অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো গুপির দিকে। কী যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। তার বুকের নিচেটা হু হু করছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। থেমে যাচ্ছে হৃদপিণ্ডের ধকধকানি। সে জড়ের মত নিশ্চল হয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে গুপির মুখের পানে।

নগেন বললে, আচ্ছা খুড়ো ভক্ত ঠাকুর্দার বয়স কত হলো গো ?

—তা তিনকুড়ি পাঁচ ত হবেই। আর কি বিয়ের বয়েস আছে ? ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! লোক হাসানো। আমাদের জাতের একটা গন্থিমাস্থি মুরুব্বি। আর তোকে কেউ মানবে ? ছাই। আমাদেরি লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

ফটিক নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো। বুকভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে আগুনে গলায় বললে, শূয়োরের বাচ্ছা আমাকে ভাসাতে চায়! দেখি কে কাকে ভাসায়।

হঠাৎ ফটিক হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, বুড়ো হলে কি হবে, শালার ছুকছুকুনি স্বভাব এখনো যায়নি। উঃ! চামার হারামজাদা রাতারাতি বোষ্টম বনে গেল মেয়েমানুষের লোভে। বুড়ো সব পারে। মোছলমানী পেলে মোছলমান হতো। আসুকতো। আমি ফটিকচন্দ্র। আমায় চেনেনা।

ফটিক উঠে দাঁড়িয়ে আদেশের ভঙ্গিতে বললে, গাড়ি যাবে না বর্ধমানে। ধানকাটার সময় গাড়ি নিয়ে ফূর্তি করবার সময় নয়। গাড়ি গেলে পাঁজা উঠবে কিসে ?

॥ দুই ॥

হপ্তা পেরিয়ে যায়। ফটিক গুম হয়ে আছে। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলেনি। না ভক্তর সঙ্গে, না তার নতুন বউটার সঙ্গে। চোখ মেলে ভাল করে এখনো দেখেইনি বউটাকে।

ভক্ত একদিন তাকে কাছে ডেকে হাসতে হাসতে বলেছিল, একলা আর থাকতে পারছিলুম না রে ফটিক। বুকচাপা খালি ঘরে যেন দম আটকে যেতো। তাই—

ভক্তর গলার সুরটা মোলায়েম আর কেমন ভিজে ভিজে। হঠাৎ যেন সে বদলে গেছে।

ভক্ত বলেছিল, আর মেয়েমানুষ না হলে ঘর বাড়ি যেন শুকনো ডাঙ্গার মতো খাঁ খাঁ করে। গরু না থাকলে যেমন গোয়াল মানায় না। ধান না উঠলে যেমন খামার মানায় না, তেমনি মেয়েমানুষ না থাকলে সংসার মানায় না। জন মুনিষ কিষেণ, দুবেলা ভাতের কাঁড়ি। চারটিখানি কথা! ভাত সেদ্ধ করা কি মরদের কাজ?

ফটিক কোন জবাব দেয়নি। মনে মনে চক্কর তুলেছে। ছোবলায়নি। আক্রোশে গজরেছে।

ভক্ত বলে, তা ছাড়া সাথি না হলে সাধন ভজন হয় না। পরকালের দিকেও তো তাকাতে হবে।

ফটিক গুম হয়ে থাকে। কালবোশেখির মেঘের মত তার মুখের ভাব। তুফানের নদির মত। বারুদের স্তূপের মত। দিনভোর সে মাঠে কাটায়। সন্ধ্যেয় বেরিয়ে যায় ইয়ার বন্ধুদের কাছে। জেলেপাড়ায়। গানবাজনার আসর বসে উড়ো কৈবত্তের

বৈঠকখানায়। মদও খায়। বেশী নেশা হলে বাড়ি ফেরে না। জেলেপাড়াতেই রাত কাটায়। ভোর থাকতে বাড়ি ফিরে আবার মাঠে যায়।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। তবে কাটা ধান এখনো সব মাঠ থেকে খামারে ওঠেনি। আর তিনচার ক্ষেপ মারতে পারলেই শেষ হবে।

জলখাবারের বেলার মধ্যে আজ সে মাঠের কাজ শেষ করবে। ধান পিটোনো, ধান তোলা, খামারের কাজটা ভক্ত বাড়িতে বসেই তদারক করে। মাঝে মাঝে নতুন বউটা এসে খামারে ঘুর ঘুর করে। ভক্ত চেয়ে চেয়ে দেখে। চোখোচোখি হলে বউটা তাকে চোখের ইশারায় শাসায়। মরণ দশা, হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? এমনি তার চোখের ভাবভঙ্গি।

বউ-এর নাম কেষ্টকলি।

সকালে গোয়াল থেকে ফটিক মোষ বের করতে যাচ্ছিলো। মাঠে ধান বইবার গাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। গোয়ালের সামনে গিয়ে ফটিক থমকে দাঁড়ালো। গোয়ালের ঘুপসি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে এক ঝলক রোদের মত, ঠাকুরদার কনে বউ কেষ্টকলি। ফটিক দু-পা পেছিয়ে সরে দাঁড়ালো। কেষ্ট বেরিয়ে এসেই ফটিককে দেখে থমকে দাঁড়াল। ফটিক একবার চোখ তুলে তার পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। কেষ্টর কাঁকালে এক ঝুড়ি গোবর। হাতে একগাছা ঝাঁটা। মাথায় কাপড় নেই। আঁচলটা কোমরে জড়ানো। মুখে চাপা হাসি।

—ফটিক?

—হাঁ। ওই আমার নাম।

মুখ না তুলেই ফটিক উত্তর দিল।

—তা আমি জানি।

ফিক ফিক করে হাসলো কেষ্ট। তার হাসি ফটিকের গায়ে আগুন ছিটিয়ে দিল। ফটিক রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল, তোমাকে গোয়াল কাড়তে কে বললে ?

—কেউ বলেনি। নিজের ইচ্ছেয়।

ফটিক ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ বাঁকালে।

—কেনে, অন্যায় হয়েছে ?

—গোয়াল কাড়বার লোক আছে। এ কাজ তোমার নয়।

চাপা হাসিতে মুখ ভরে কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, তা'লে আমার কি কাজ ?

বিরক্তির স্বরে ফটিক বললে, আমি কি জানি ? তোমার কর্তাকে জিজ্ঞেস করগে।

ফিক করে কেষ্ট হেসে ফেললে। ফটিকের গা জ্বালা করে উঠলো। সে মুখ ঘুরিয়ে গোয়ালে ঢুকছিল। কেষ্ট ডাক দিল, শোনো ফটিক।

ফটিক তারদিকে না ফিরেই তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিল, মাঠে যাবার বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাজে কথার সময় নেই এখন।

—বাজে কথা নয়। কাজের কথা।

তার গলার স্বরটা বেশ তেজালো আর ভঙ্গিটা অনেকটা পাঠশালের গুরুমশায়ের মত।

ঘুড়ে দাঁড়াল ফটিক।

—কী ?

ঘাড় বেঁকিয়ে কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, তুমি রাত্রে বাড়ি আসনা কেন ?

—আসি না আসি তাতে তোমার কি ?

—আমার সব। কোথায় থাক রাতভোর? জেলে পাড়ায়?

—হাঁ। তাতে হয়েছে কি?

—সেখানে মদ ভাঙ্ চলে?

—চলে। তাতে তোমার মাথাব্যথা কেন?

আবার হেসে উঠলো কেষ্ট। তার এই হাসির মাঝে যে কি আছে কে জানে। ফটিককে ক্ষেপিয়ে তোলে।

হাসি থামিয়ে সে বললে, আমার মাথা ব্যথা কেন পরে জানলেও চলবে। তোমার মাথার জট ধরে কে টানে তাই বলো। জেলেপাড়ার কুসমী জেলেনী?

চমকে উঠলো ফটিক।

আবার সেই উছলে উছলে হাসি। ফটিক অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো, হ্যাঁ কুসমী। তাতে হয়েচে কি? কুসমী কি ফেল্না নাকি?

—কুসমী কেন ফেল্না হবে? সে দামি। তুমিই তার কাছে ধূলোমাটির চেয়ে সস্তা।

—বেশ তাতে হয়েছে কি? দোষটা কিসের? বাহাত্তুরে বুড়োর যদি এখনো মেয়েমানুষের দরকার হয় আমার হবে না কেনে?

নিঃশব্দে মুখ নিচু করে ধীরপায়ে কেষ্ট নেমে গেল উঠোনে। হঠাৎ থেমে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, বিয়ে করো না কেনে?

—ফুঃ! বিয়েয় আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

মোষের কাঁধে জোয়াল দিয়ে গাড়িতে উঠছিল ফটিক।

পেছন থেকে ডাক দিল কেষ্ট: এই হিমে আদুর গায়ে যেওনা। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে যাও।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে তারপর ফটিক বললে, কেনে চাদর রয়েছে তো ?

—তা হোক। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে যাও। চাদর জড়িয়ে মাঠের কাজ হয় না।

নিঃশব্দে ফটিক তার হাত থেকে গেঞ্জিটা নিল। দুজনে দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হলো।

ফটিক জিজ্ঞেস করলে, মোষের শিঙে, খুরে, তেল মাখালে কে ?

—আমি।

—কে বললে তোমায় ওসব করতে ?

কেষ্ট ভ্রূভঙ্গি করে ঝলসে উঠলো, কে আবার বলবে ? আমার ইচ্ছে হলো আমি মাখালুম। তোমাকে গেঞ্জিটা দেবার ইচ্ছে হলো তাই দিতে এলুম। কেউ বলেছে নাকি ? আমি কারুর বলার ধার ধারিনি।

এলো আঁচল দুলিয়ে অস্থির আঁকাবাঁকা পায়ে সে খামারের ভেতর চলে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে ফটিক কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফটিকের মনটাকে কেষ্ট এলোমেলো করে দিয়েছে। তার ধৃষ্টতায় সে চমকে গেছে। সে অবাক হয়ে গেছে তার গিন্নিপনা দেখে। সে কারুর বলার ধার ধারেনা। সে কারুকে গ্রাহ্য করেনা। এ সংসারে সেই যেন সর্বময়ী। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা। তার ইচ্ছাতেই সব কিছু হবে। তার ইচ্ছার ওপর কারুর কোন কথা বলা চলবে না। তার ইচ্ছায় তাকে গেঞ্জি গায়ে দিতে হবে। হাসি পায় ফটিকের। কিন্তু হেসে তার সর্বনেশে ইচ্ছাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এমনি ভাব দেখাল যেন সবই তার। গোয়াল, মোষ, খামার, বাড়ি সবই

তার। ফটিক যেন তার তাঁবেদার। এ সব যেন তার জন্মস্বত্ব। সে যেন এখানে জন্মেছে আর ফটিক এখানে নতুন এসেছে।

ফটিকের বুকের নিচেটা জ্বালা করে। এ অধিকার তাকে কে দিল? এ সব তার ঠাকুরদার খেলা। এই জমিজমা ঘরবাড়ির লোভ দেখিয়েই ওকে নিয়ে এসেছে। নইলে ও আসবে কেন? কিসের লোভে ঐ বুড়োর গলায় মালা দেবে?

ফটিক ভাবে। কেষ্টকে ভাবে। আজ সে প্রথম তাকে ভাল করে দেখল। বয়স তো বেশী নয়। মুখখানা কচি কচি। কুশ্রীও তো নয়। বেশ লম্বা মাথা-উঁচু দেহ। স্বাস্থ্যটা ভাল না হলেও হাড় ডিগডিগে কোল-কুঁজো কাঁকাল-ভাঙা নয়। বোধ হয় খুব গরীবের মেয়ে। পেটভরে খেতে পেতো না। যত্ন আত্তি পেতো না। নইলে বুড়োর হাত ধরে এখানে আসবে কেন?

সব চেয়ে ভাল ওর ড্যাব-ড্যেবে টানা চোখ দুটো। চোখের কোল-দুটো কানের কাছ পর্যন্ত ঠেল মেরেছে। পোটোর আঁকা প্রতিমার চোখের মতো। চোখের দৃষ্টিতে যেমন ঝাঁজ আছে তেমনি স্বস্তির আশ্বাসও আছে। আর কথায় যেমন বিষ আছে তেমনি মধুর একটি কোমল টানও আছে।

ফটিক আনমনা হয়ে পড়েছিল।

মোষ দুটো হঠাৎ এলোমেলো হয়ে রাস্তা ছেড়ে গাড়িখানাকে একটা পগারে এনে ফেলেছে। একদিক কাত হয়ে গাড়িখানা উলটে যাবার অবস্থা। ফটিক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে জোয়াল ধরে গাড়িখানাকে রাস্তায় টেনে তুললে। রাগের মাথায় পাঁচন বারি মেরে মোষদুটোকে শায়েস্তা করে দিল। বললে, শালারা মেয়েমানুষের হাতের তেল মেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলছো?

মাঠে গিয়েও কি ছাই ফটিকের সোয়াস্তি আছে। দলবল এসে

তাকে ছেঁকে ধরে। নতুন ঠাকুরমার খবর জানতে চায়। ভক্তর খবর শোনবার জন্যে ছোঁকছোঁক করে।

ফটিক রাগে গর গর করে। লজ্জায় মুখ তুলে কারুর পানে তাকাতে পারে না।

সেদিন শিবতলায় গাঁয়ের বাবুরা পর্যন্ত তাকে ছেঁকে ধরেছিল। কেমন ঠাকুমা হোল রে ফটকে?

ফটিক হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, এজ্ঞে, বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়ে দেখে আসবেন, আর বরকনেকে আশীর্বাদ করে আসবেন।

পরাণ হালদার মশায় রসিক লোক। চুপি চুপি ফটিককে বলেছিল, তোরি বরাত খুললো রে ফটকে। বুড়ো গাছ প্রতিষ্ঠে করে যাচ্ছে। তুই ফল খাবি।

কানাই হাজরা ঠোঁটকাটা লোক। খোলাখুলি বললে, তুই যদি ডবকা ঠাকুমার সঙ্গে জুটতে পারিস তবেই বুঝবো তুই মরদ। তবেই বুড়ো বেটার আক্কেল হবে।

—কি যে বলেন আপনারা?

পরাণ হালদার তার পিঠ চাপড়ে বললে, লজ্জা কিসের? ঠাকুমা তো রসের সম্বন্ধ। করনীয় ঘর। কোন দোষ নেই। আমরা বিধেন দিচ্ছি।

গ্রামের ভদ্র তরুণ সমাজ ফটিককে স্নেহের চোখে দেখে। গ্রামে একটি সখের থিয়েটারের দল আছে। ফটিক প্রিয়দর্শন এবং সুকণ্ঠ। বাবুরা মাঝে মাঝে তাকে থিয়েটারে মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করায়। তা ছাড়া ফটিকের সরল অমায়িক ব্যবহার সকলকে আকর্ষণ করে। কাজেই ভদ্রসমাজে সে অপাংক্তেয় ছিল না। কিন্তু ফটিকের নিয়তি নির্দয়। একেই তার মায়ের চরিত্রের জল্পনা

তার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল তার ওপর আবার ঠাকুরদা তাকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। জনসমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার তার আর ঠাঁই রইলো না।

সে কদিন লজ্জায় মাথা তুলতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে কিংবা মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়েছে। পরাজয়ের লজ্জা মোচন করবার জন্য। এত বড় দুঃসহ পরাজয় আর হীনতা আর কখনো সে অনুভব করেনি। তার ঠাকুরদা যেন একটি আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। তার পাঁজর ভেঙ্গে দিল। ঠাকুরদা যাই হোক তবু সে তারি স্নেহসিক্ত নয়নতলে লালিত। তার মনে দৃঢ়মূল ধারণা ছিল যে ঠাকুরদা আর যাই করুক তার ওপর কখনো অবিচার করবে না। তার সঙ্গে কখনো বেইমানি করবে না। কিন্তু এ তো তাকে ভাসিয়ে দেবার চক্রান্ত।

নিশ্চয়ই মেয়েটাকে ঐ আশ্বাস দিয়েই ফুসলে এনেছে। সবই তাকে দেবে। আর ঐ অজাত কুজাতের মেয়েটা সেই বিশ্বাসেই এরি মধ্যে সংসারে জেঁকে বসেছে। সব বুঝে শুঝে দখল পাকা করে নিচ্ছে। মুখের ওপর বললে, সবই আমার। রাগে তার সর্বশরীর জ্বালা করে উঠেছিল। কিন্তু শয়তান মেয়েটা হাসি দিয়ে তার রাগকে ঢেকে দিল।

কী যে গলগলিয়ে হাসে! অলুক্ষণে হাসির তোড়ে গা শিউরে ওঠে। বুক গুর গুর করে। ভেতরে কাঁপুনি ধরে, ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মতো। হাসিটা যেন ওর স্বভাবের একটা অঙ্গ।

কোন জাতের মেয়ে, কে জানে। তুক-তাক জানা বেদেনী নয় তো? জাদুকরী নয় তো?

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে ঠাকুরদা। ও সর্বস্ব গ্রাস করবে। ভিটেমাটি চাটি করে ছাড়বে। ঠাকুরদা তো ভূত হয়ে

গেছে ওর ড্যাবরা চোখের ঝলকানিতে। গলায় কণ্ঠি আর ভেতরে নেংটি পরিয়ে বোষ্টম সাজিয়ে এনেছে। এই বার গলায় ভিক্ষের ঝুলি আর ভেতরের নেংটি সার করে পথে বের করে দেবে।

ধুরন্ধর খলিপা মেয়ে। এখন থেকে সাবধান না হলে রক্ষে আছে?

ফটিকের হাসি পায়। এরি মধ্যে কুসমীর ও খপর রেখেছে। এদিকে কিন্তু রাশভারি আছে। কথা বলে দিব্যি মুরুব্বিয়ানা চালে। যেন গুরুমশায়। তাকে শাসনে রাখতে চায়।

ফটিক মনে মনে হাসে।

কিন্তু ভক্তর হলো কী? সে যে সত্যি সত্যিই রীতিমত ভক্ত হয়ে পড়ল! ভোরে উঠে হরিনাম করে। মন্দিরা বাজিয়ে গাঁয়ের পথে পথে টহল দেয়।

"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরে নাম।"

গোঁসাই পাড়ায় গিয়ে মহাপ্রভু তলায় নাম দেয়। শ্যামসুন্দর তলায় নাম গায়। গাঁয়ের যেখানে যত বৈষ্ণবের মন্দির আছে সব ঘুরে বেলা হলে বাড়ি ফেরে। কত লোকে কত কথা বলে, কত ঠাট্টা ইশারা করে, ভক্ত গ্রাহ্যও করে না। হাসে আর নাম করে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে নেচে নেচে গান করে।

ভক্তকে নিরেট পাষণ্ড বলেই গাঁয়ের লোকে জেনে এসেছে। ভক্ত নাম ছাড়া যে তার মাঝে ছিটেফোঁটা ভক্তির রস ছিল কেউ কোনদিন ধারণা করতেও পারেনি। এমন কুকার্য নেই যে ভক্ত করেনি।

জোয়ান বয়সে সে ছিল নামজাদা লেটেল। কালো লোহাপেটা

ছেয়ালো শরীর। চেপটা চোয়াল। চওড়া ছাতি। মোটা কব্জি। কব্জির জোরে বুনো মোষের শিঙ ভেঙ্গে দিয়েছে। কবে পালেদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তলোয়ার শরকি ধারী ডাকাতদের লাঠির জোরে ঘায়েল করে দিয়েছিল একা ভক্ত।

মদ খেয়েছে। গোটা পাঁটা একা খেয়েছে যে ভক্ত সে এই বুড়ো বয়সে একটা ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে যে বৈরাগী হয়ে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল।

মাছ মাংস ছেড়েছে। আতপ চালের ভাত খায়। চিতে বাঘের মত সর্বাঙ্গে তিলকমাটির ছাপ কেটে রাধারাণীর জয় দেয়। জয় রাধে! জয় রাধে!

কেষ্টকলি তার রাধিকা। তার সাধন ভজনের লীলা সঙ্গিনী। তার পানে চেয়ে চেয়ে সে আত্মহারা। কেষ্টকে দেখে তার সাধ মেটে না। তাকে চোখের আড়াল করতে প্রাণ চায় না। তাকে পাওয়া জীবনে তার এক পরমাশ্চার্য ব্যাপার। তার নিজেকে ধন্য মনে হয়। রাধারাণীর কৃপা ছাড়া এ অদেষ্ট হয় না। বহুমূল্য গুপ্তধনের মত সে তাকে লোকচক্ষের আড়ালে রাখতে চায়।

কেষ্ট কিন্তু এখানে এসেই সংসারে গা ঢেলে দিয়েছে। তৈরি সংসার। একটু মেজেঘোসে শুধু চকচকে করে তুলতে হবে। রান্নাঘরের অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করে ঘরের ভোল বদলে ফেললো। ভাঁড়ার গোছালো। গোয়াল, খামার দেখাশুনো করলো। রীতিমত গিন্নীর মত সংসারে আধিপত্য বিস্তার করলো।

ফটিকের ভাল লাগলো না। এর মাঝে সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল। তাকে স্থানচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র। নিজের দখল পাকা করে নিয়ে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে। 'নিজে না দিক

বুড়োকে দিয়ে দেওয়াবে। বুড়ো এখন ওর হাতের পুতুল। যেমন নাচাবে তেমনি নাচবে।

খামারে ধান ঝাড়া হচ্ছে। উঠোনে মরাই বাঁধার ব্যবস্থা হচ্ছে। বর পাকানো হচ্ছে। তিনটে মরাই। পাশাপাশি। বিঘত উঁচু শক্ত বেদির ওপর তালকাঁড়ি আর কাঠের মাচান পেতে তার ওপর মরাই বাঁধা হবে। গোবর দিয়ে নিকোনো উঠোনটা তকতক করছে। কেষ্ট মরাই-এর সামনে আলপনা দিয়েছে। পুরুত শ্যাম-পাণ্ডা সকালে মরাই পূজা করে গেছে। শুভ দিনে শুভলগ্নে চাষির ঘরে ধান মরাইজাত করা হয়। নবান্ন ও পৌষ পার্বনের মত এইদিনটিও চাষিরা উৎসব করে ঘরে শস্যজাত করে। বৎসরের চাষের পালা সাঙ্গ হলো। পৌষ এলো ঘরে। চাষি ধানের আঁটি ছুড়ে দেয় গাছের মগডালে। মেয়েরা নতুন শাড়ি ও গয়না পরে। ঠাকুর ঘরে পূজো পাঠায়। বাড়িতে পায়স পিঠে রান্না করে। ছেলেমেয়েরা সুর করে গান গায় "পৌষ এলো ঘরে"।

কেষ্ট আমলা দিয়ে মাথা ঘসেছে। চিকন চুলগুলো পিঠের ওপর দিয়েছে এলিয়ে। হাতের কাঁকনের সঙ্গে লাল রঙের কাচের চুরি পরেছে। একখানা কমলালেবু রঙের পাটের শাড়ি পরে এলোচুলের ঢেউ তুলে এ-ধার ও-ধার ঘোরাঘুরি করছে। ধান পিটতে পিটতে মুনিষ কামিনীগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে মুগ্ধ প্রশংসার দৃষ্টিতে। সত্যিই তাকে বেশ দেখাচ্ছে। বাড়িতে মেয়ে ছিল না। বাড়ি মানিয়েছে। ফটিকের চোখেও ভাল লাগে। কিন্তু চোখের এই ভালো লাগাটাই ফটিকের গায়ে বিছের কামড় দেয়। তার শরীর জ্বালা করে। এমনি ভাবে বিজয়দর্পে সে চলাফেরা করছে, মুখে চোখে এমনি প্রভুত্বের ভাব ফুটে উঠেছে যে ফটিকের দেখে মনে হয় যেন সেই এ সংসারের প্রভু। আর সব তার

আজ্ঞাকারী ভৃত্য। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যেই যেন এত আয়োজন। এত উপচার।

ফটিক তারপানে চোখ তুলে চাইতে পারে না। চোখ জ্বালা করে। হিংসায় আর আক্রোশে। কেষ্ট কিন্তু তাকে আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর মিটিমিটি হাসে। তার চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের শিখার মত হলকা ঠিকরে আসে। সেই উত্তাপ যেন ফটিকের সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করে। ফটিক শিউরে ওঠে। তাই আচমকা তার সামনে এসে পড়লে সোজা চোখ তুলে সে তার মুখ পানে তাকায় না। কেষ্ট তার সামনে এলেই সে ভারি অস্বস্তি বোধ করে। অথচ দূর থেকে তাকে দেখে চোখ দুটো প্রসন্ন হয়। ওর আবির্ভাবে বাড়িটার সত্যিই চেহারা পালটে গেছে। মেয়ে না হলে বাড়ি মানায় না। মেয়েরাই তো বাড়ি। বাড়ির প্রাণ।

ফটিকের এই চাপা আক্রোশটাকে কেষ্ট সমীহ ভাবে। তার এই সমীহ দেখে কেষ্ট মনে মনে খুসিই হয়। কেষ্টর ধারণা ফটিক লাজুক, তাই তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। চোখ তুলে তার মুখের পানে তাকাতে পারে না। কেষ্ট মনে মনে হাসে। ফটিককে দেখলেই তার হাসি পায়। চোখেও তার ভালো লাগে বই কি তার হৃষ্টপুষ্ট নধর চেহারাটি।

ভক্ত আড়ালে ডেকে ফটিককে বলে, ওর সঙ্গে মানিয়ে চলিস রে ফটিক তা হলে ও-ও তোর সঙ্গে মানিয়ে চলবে। তোকে যত্ন আত্তি করবে।

ফটিক মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয়, আমাকে আর যত্ন আত্তি করতে হবে না। আমি পারবো না।

—কী পারবি নে?

—ওঁর মন রেখে চলতে। আমার সঙ্গে ওর খাতির কিসের? তুমি তোমার অপ্সরীর চরণে তেল মাখাও। মাথায় করে নাচো। যা খুসি করগে। আমার সঙ্গে ওর বুনিবনাও হবে না।

ভক্ত মনে মনে হাসে। বলে, বুনিবনাও হবে না কেন? এক বাড়িতে থেকে বুনিবনাও না হলে চলবে কেন?

ফটিক আগুন হয়ে বলে ওঠে, না চলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

—মাথা গরম করিস নে ফটিক। ভাল করে থাকি আর মন্দ করে থাকি, করেছি যখন তখন সেটা নিয়ে অশান্তি করে হবে কি?

ফটিক মাথা নেড়ে বলে, যা করেছো খুব করেছো। লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। গায়ে থুতু দিচ্ছে। তোমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া তাই তুমি খত্তাল বাজিয়ে গাঁয়ের পথে পথে ঘোর। ছেলেগুলো যে ইঁটপাটকেল ছোড়ে না, এই তোমার ভাগ্যি।

রাধে গোবিন্দ! সশব্দে হেসে ওঠে ভক্ত। বলে, লোকে কি বলে না বলে তাই নিয়ে তুই মাথা ঘামাস্ কেন? বলুক না যার যা খুসি। বাঁচতে হলে অমন অনেক শুনতে হয়। অনেক সইতে হয়। হাসবার লোক অনেক পাবি ফটিক কিন্তু দুঃখে কাঁদবার লোক একজনও পাবি না। আমার দুঃখ্যুটা কে বুঝলে? আমাকে বাঁচতে হবে তো?

—এমন করে না বাঁচাই ভালো। বাঁচবার জন্যে সব খোয়াতে হবে নাকি?

—খোয়ালুম আবার কইরে? পেলুমই তো দুহাত ভরে। আমি যা পেলুম মাথা খুঁড়ে কেউ পাক তো দেখি? রাধারাণীর কৃপাদৃষ্টি ছিল আমার ওপর তাই পেয়েছি। আঁধার ঘরে মাথা ঠুকে মরছিলুম। ঘরে আমার আলো জ্বলেছে। পরের হিংসে হবে বই কি! রাধে গোবিন্দ! ঠাকুরের নামেও যে কত কলঙ্ক। লোকে

রাধারাণীকে বলে কলঙ্কিনী। দূর দূর! ও-সব কথায় তুই কান দিসনি। যে যা খুশি বলুক। যত পারে বলুক। সইব বলেই তো বৈরাগী হয়েছি। প্রেমের মন্তর নিয়েছি।

—কাল করলে এঁড়ে গোরু কিনে। চাষার ছেলে গলায় কণ্ঠি ঝুলিয়ে গোঁসাই হতে চাও। এতো সোজা নয়।

ভক্ত হাসে। বলে, সোজা নয়। সোজা নয়। রাধারাণীর চরণে ঠাঁই পাওয়া কথার কথা নয়। জীবন ভোর সাধতে হবে আর কাঁদতে হবে। সেই সাধার মাঝেই পাওয়া। এর মর্ম তুই কি বুঝবি? কেউ বোঝেনা। এক বোঝে রসিক গোঁসাই ঠাকুর। মহাপ্রভু তলায় পাঠ হবে। শুনে আসিস।

—আমার আর শুনতে হবে না। তুমি শুনো।

কেষ্টকলি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। ফটিকের গা ছমছম করে।

একমুখ হেসে ভক্ত বলে ওঠে, জয় রাধে, জয় রাধে! রাধারাণী এসো। এসো রাইকিশোরী!

মুখ বেঁকিয়ে কেষ্ট বলে, রাধের ভাঁড়ার যে খালি। ঢন ঢন করছে। আজকের দিনে লোকজনদের পাতে দোব কি? একবার বেনের দোকানে যেতে হবে। আর শিউলি বাড়ি থেকে একটু নতুন গুর আনতে হবে।

কেষ্ট চোখের কোণ দিয়ে ফটিকের পানে তাকাল। তার ঘাড় ঝুলে পড়েছে। চেয়ে আছে মাটির পানে। তার ভঙ্গি দেখে মুখ টিপে হাসলো কেষ্ট।

ভক্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, যা রে ফটিক। যা, যা দেখে শুনে সব এনে দে। আজকের দিনে একটু ভাল করে ভোগের বেবস্থা করবে বই কি? ওর হাতের কামিনী-ভোগ চালের পায়েস

খেলে ভুলতে পারবি নে। কী রান্নাই রাঁধে তোর ঠাকুমা। দেখতে ছোট্টটি হলে হবে কী? রান্নায় দোপদি।

কেষ্ট মুখ বেঁকিয়ে বললে, ঠাকুমা আবার কি? মা হলুম না, ঠাকুমা?

—তা কি বলে ও ডাকে তোমাকে?

—ওকি আমায় ডাকে না কি? কপাল আমার! আমাকে দেখলেই ভয়ে আড়ষ্ট। যেন ভূত দেখেছে। আমার সঙ্গে আপনা থেকে একটা কথাও বলে না। ভাব ও করে না। আমাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। যেন আমি ওর সতীন।

হুলো বেড়ালের মত মুখ ফুলিয়ে ফটিক বললে, কি আনতে হবে তাই বলো! আর ভাবে কাজ নেই।

কেষ্ট মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার কিসের ঝগড়াটা তাই বলোনা। তোমার ঠাকুর্দা একটা আপোষ করে দিক।

—খুব হয়েছে। উনিই নাটের গুরু। উনি করবেন আপোষ।

রাগে গর গর করতে করতে ফটিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেষ্ট খিল খিল করে হেসে উঠল।

ভক্ত হাসতে হাসতে বললে, ওর রাগ তো তোমার ওপর নয়। যতো রাগ আমার ওপর।

মুখ ভার করে কেষ্ট বললে, আমার জন্যেই তো।

ভক্ত সম্মোহিতের মত তার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, তোমার জন্যেই তো সব কেষ্টকলি!

—কী সব?

—সব সব। এই ঘর সংসার, ক্ষেত খামার, গোরু বাছুর সব তোমার। তুমিই তো ঘরের লক্ষ্মী।

কেষ্ট তার কাছে সরে গিয়ে বললে, তুমি তো বলছো লক্ষ্মী ওরা ভাবে অলক্ষ্মী।

ভক্ত তার রেশমের মত রুক্ষ চুলের মাঝে হাত ডুবিয়ে বললে, ইস্! তোমার পয়েই এবছর এতো ফলন। তুমি লক্ষ্মীর মতো কাঠা ভরে ধান মাপতে মাপতে আমার ঘরে এসে উঠেছো। গাঁয়ের বামুন সজ্জন সবাই বলেছে, বউ তোর পয়মন্ত রে ভক্ত।

মোহিনী হাসি হাসল কেষ্ট। হাসির ঢেউ লেগে ভক্তর শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। আবেশের ঘোর লাগল তার মনে। সে কেষ্টকে বুকের মাঝে টেনে ভিজে গলায় ডাকল, কেষ্ট! কেষ্টকলি!

—আমার ভারি ভয় করে।

চাপা গলায় কেষ্ট বললে।

—ভয়? কেন, কিসের ভয় রাই?

—ফটিক যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়?

—ইস্! সাধ্যি কি?

—গাঁয়ের সবাই বলে, এসব জমিজমা নাকি ফটিকের।

—কে বলে?

—কার নাম করবো? তোমারি সব আপনজনা।

—কে? ঐ গুপের মাগ বুঝি?

—শুধু সে কেন? আরো অনেকে। সে কথায় কাজ কি? তুমি আমায় ভরসা দিচ্ছো তো? তোমার কথায় বিশ্বাস করেই আমি তোমার সঙ্গে এসেছি। তুমি বলো। তুমি আমায় ভরসা দাও।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এ সব আমাদের। আমার অবর্তমানে সব আমার কেষ্টকলির। আমার রাইকিশোরীর।

—আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

হাসলো কেষ্ট। মধুর তপ্ত হাসি।

॥ তিন ॥

মাঘের শীতে মোষের শিঙ নড়ে। বিদায় নেবার আগে একবার মরণ কামড় দিয়ে যায়। নেবার আগে প্রদীপ শিখার মত। ক'দিন মেঘলা করে উত্তরে হাওয়ার শেষ দাপটে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। বৃষ্টিও নামল গুঁড়ি গুঁড়ি। শীতের বৃষ্টি যেন গায়ে পাঁচন বাড়ি মারে। তবু মাঘের শেষের বৃষ্টি চাষার মনে আশা জাগায়। শুভলক্ষন। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ। দেশের ভবিষ্যৎ ভাল। সামনের উজ্জল দিনগুলোর কথা পড়িয়ে দেয় চাষির মনে।

ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। শনশনে উত্তরে হাওয়ার তাড়া খেয়ে বিষ্টিগুলো এলোমেলো হয়ে ছুটোছুটি করছে। লিকলিকে বেতের মত তীব্র হাওয়া। গাছের মাথায় চাবুক মেরে পাতা খসিয়ে দিচ্ছে। বার বাড়ির উঠানের ফুলন্ত সজনে গাছ থেকে ফুল খসে পড়ছে ঝর্ণার মত। পাশের টোপাকুলের গাছ থেকে ডুমো ডুমো কাঁচা কুলগুলোও আছড়ে পড়ছে মাটিতে। ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে।

কেষ্ট একটা ছোট চুপড়ি হাতে নিয়ে জলে ভিজে ভিজে সজনে ফুল আর কুল কুড়োচ্ছিল। মাথায় একখানা নটকানে ছাপানো বাসন্তী রঙের গামছা। পরনে একখানা ডুরে শাড়ি। শাড়ির আঁচল উড়ছে। গামছাখানা পিঠের উপর ঝাপট দিচ্ছে। কেষ্ট আনত ভঙ্গিতে মাটি থেকে ফুল কুড়ুচ্ছে।

ফটিক দুপুরের ঘুম থেকে উঠে চণ্ডিমণ্ডপে বসে তামাক

খাচ্ছিল। আর বাইরে আকাশের লীলা দেখছিল। চাষির এখন আরামের সময়। তার. বুক এখন ভরা-ভরতি। ঘরে ধান। মাঠের কাজ শেষ হয়েছে। মনে এখন মুক্তির চেতনা। দেহে ভোগের তাড়না। কামনা বাসনায় অলস মন ফুটন্ত জলের মত টগবগ করে। চাষি বউদের যত কিছু সাধ আহ্লাদ, আদায় আবদার এই সময়। এমন দিনে চাষি বউ বিনুনী করে খোঁপা বাঁধে। মুখে সর ময়দা মাখে। চোখে কাজল দেয়। কপালে টিপ পোঁকার টিপ পরে। রঙে ছোপানো শাড়ি পরে। গয়না পরে।

ঘরে ধান ওঠার সঙ্গে চাষি বউ-এর ও রূপের বাহার খোলে। তনু ভোগের বাসনা জাগে। এই ক'মাস চাষি নিজেকে মানুষ ভাবে। তারপর আবার কোন ফাঁকে মোষের পালের মত নতুন মেঘ জমে রৌদ্রদীপ্ত আকাশে, কালবোশেখির ঝড় ছুটে আসে ঈশান কোণ থেকে, মেঘ ডাকে গুরু গুরু করে বুড়োশিবের গাজনের ঢাকের বাদ্যির মত, তখন আবার চাষির টনক নড়ে। বিদ্যুতের ঝলকানি তাকে ইশারা করে। দিগন্তবিস্তারী শূন্য মাঠ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মাঠে। চাষি বউ-এর প্রাণ পড়ে থাকে মাঠে। এই কটাদিনই তাদের পুরুষকে মানুষ ভাবতে পারে। বাকি ক'টা মাস তারা রোদে পুড়ে আধমরা। অঝোর বর্ষায় ভিজে চ্যাব্‌চেবে। গায়ে কাদামাটি মেখে উইঢিপি। না থাকে তার দেহে কোন লিপ্সা না থাকে রক্তের কোন উত্তাপ।

কেষ্টকে জলে ভিজতে দেখে ফটিক দাওয়ায় এসে ডাক দিল, এই! জলে ভিজছো কেন?

কেষ্ট চোখে বিদ্যুৎ হেনে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে দাওয়ায় উঠে এসে সে ধমকের সুরে বলল, 'এই' আবার কি? আমার নাম নেই নাকি?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফটিক বললে, নাম থাকলেও তো নাম ধরে ডাকতে পারি না।

মুখ ভেংচে কেষ্ট বললে, তাই বলে 'এই' বলবি নাকি? আমি কি সাঁওতালনী না কুসমী জেলেনী?

মুখ ঘুরিয়ে ফটিক তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, তবে কি বলতে হবে? ঠাকুমা না ঠান্‌দি?

ফিক করে হেসে ফেললো কেষ্ট। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, ছিঃ! মাগো! ঠাকুমা! কেনে আর কিছু বলা যায় না?

—কী?

কেষ্ট ফিক ফিক করে হাসে আর মুখের উপর থেকে উড়ো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে কি যেন ভাবে। ফটিক তার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখে।

হঠাৎ কেষ্ট যেন পথ হারিয়ে বলে ওঠে, কেন, নাম ধরে ডাকলেই বা কি? আমার সামনে হুঁকো খেতে নজ্জা নেই আর নাম ধরে ডাকতেই যতো নজ্জা? নামটা আমার কি মন্দ। কেষ্টকলি। ফুলের নাম।

ফটিক তার চুপড়ির পানে চেয়ে বললে, সজ্‌নে ফুল ও তো ফুলের নাম।

হেসে উঠলো কেষ্ট। বললে, তাই যদি তোর পছন্দ হয় তাই বলিস। আমি কিন্তু তা হলে তোকে টোপা কুল বলবো।

দুজনেই একসঙ্গে হাসলো।

ফটিক এই প্রথম কেষ্টর সামনে হাসল।

কেষ্ট খুশিভরা মুখে বললে, এই তো। এমনি হাসি মুখে ভাব করলেই তো আর কোন জ্বালা থাকে না। তা নয় মুখে গোবর

মাটি মেপে উট্‌কো মুখোর মতো কেবল কোঁদল করা। আমি তোর সতীন নাকি? তোর ভাতার কেড়ে নিইছি?

ফটিক হেসে ফেললো।

কেষ্ট বললে, আমি ভাবতুম তুই হাসতে জানিস নি। কুঁদুলে মাগিদের মত তাই মুখ কালো করে সদাই ঘোঁত ঘোঁত করিস। তুই কি মেয়ে নাকি যে মেয়েমানুষের সঙ্গে রেষারিষি করবি? তুই পুরুষ। আমি মেয়ে। আমরা প্রায় একবয়েসী। এক বাড়িতে এতো কাছাকাছি থেকে আমাদের ভাব হবে না কেনে?

—আমার ভাল লাগে না।

—কী ভালো লাগে না। আমাকে?

—হ্যাঁ।

কেষ্টর মুখখানা পাঙাশ হয়ে গেল। একটু পরেই আবার তেতে লাল হয়ে উঠল। চোখ দুটো বড়ো হয়ে জ্বলে উঠলো। মুখে ফুটে উঠল একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব। দুজনে দুজনের পানে চেয়ে রইলো। একদৃষ্টে।

কেষ্ট নিজেকে সামলে নিয়ে আচমকা খিল খিল করে হেসে কথাটা উড়িয়ে দিল। চূর্ণ চূর্ণ হাসির তরঙ্গগুলো আগুনের ফুলকির মত ফটিকের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। ফটিক ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে সরে দাঁড়াল।

হাসির ঢেউ তুলে কেষ্ট বললে, ভালো না লাগলেও কি ভাব করে একসঙ্গে থাকা চলে না?

ফটিক দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিল, না। চলে না। দুষমনী করতে যে এসেছে তার সঙ্গে দুষমনী করতেই হবে।

—কে বললে আমি তোমার সঙ্গে দুষমনী করতে এসেছি?

বিস্মিত কণ্ঠে কেষ্ট প্রশ্ন করলো।

—আলবৎ করবো। তোমরা কি ভাবো হুমকি দিয়ে চোখ রাঙিয়ে আমায় বাড়ি থেকে বিদেয় করবে? তোমাদের ভয়ে আমি সুর সুর করে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবো?

—তা কি কেউ যায়?

ফটিক কলকেটায় জোরে জোরে ফুঁ দিতে দিতে বললে, আমার মামলা করতে পয়সা খরচ হবে না। আমাদের গাঁয়ের বর্ধমানের বড়ো উকিল উমোচরণ দত্ত। তাঁর বউ মহাপিসী আমায় ছেলের মত ভালবাসে। তাঁর চরণে গিয়ে পড়লেই আমার আর কিছু ভাবতে হবে না। আর দত্ত মশায়ের জানতে কিছু বাকি নেই। তাঁরই হাতের তমসুক তাঁর দ্বারাই রেজেষ্ট্রি করান। হিম্মত থাকে লড়ে দেখো তোমরা, কত ধানে কত চাল।

কেষ্ট নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। তার মনে হলো আজ সে প্রথম ফটিককে দেখল। তাকে চিনল। ফটিককে সে আগে দেখেনি। কিংবা এতোদিন তার চোখে পড়েনি ফটিকের এই সুস্পষ্ট পৌরুষ। সে লক্ষ্য করেনি তার পেশীবহুল বলিষ্ঠ কাঁধ, তার সুপ্রশস্ত বুক, তার মাথাটা হেলবার একগুঁয়েমি ভঙ্গি, তার গৌর মুখের ওপর কালো ভুরুর উদ্ধত রেখা, তার কালো বড়ো বড়ো চোখের অগ্নিময় দৃষ্টি, তার সুন্দর ঠোঁটের উপর সরু গোঁফের কালো বক্র রেখা। আজ প্রথম সে পরিচয় পেল তার আদিম প্রাণশক্তির। মনে প্রাণে স্বীকার করতে হলো সে পুরুষ। শক্তিমান দুঃসাহসী পুরুষ।

ফটিক নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে কেষ্ট বললে, তার চেয়ে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ করে নিলে হয় না?

—কিসের আপোষ? নিজের হক ছেড়ে দিয়ে? এক তিলও

আমি ছাড়বো না। "নাহি দিব সূচগ্র মেদিনী"। থিয়েটারের মহলা শুনে পংক্তিটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ফটিকের।

কেষ্ট কিন্তু তার অত বড় উক্তিতে ভয় পাওয়া দূরে থাক খিল খিল করে হেসে উঠল। নির্লজ্জা মেয়ে! ফটিকের গা জ্বালা করে।

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বললে, তবে আর কি হবে? দেখি, তোমার ঠাকুর্দাকে বলে, যদি—

ফটিক ঝাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে বলে উঠলো, বলগেনা। ভয় দেখাচ্ছ কাকে? আমি থোড়াই কেয়ার করি তোমার প্রেমের বৈরেগী ঠাকুরকে।

কেষ্ট ভঙ্গিটাকে করুণ করে বললে, তোমায় ভয় দেখাবো কেনে? ভয় তো আমারই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমি উলুখড়। আমি কেনে মাঝে পড়ে মার খাই। তার চেয়ে সময় থাকতে সরে পড়া ভাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতল নিরাশার কণ্ঠে কেষ্ট বললে, আমিই চলে যাবো। আমার অদেষ্টে সুখ নেই। তোমরা করবে কি?

ভগ্নভঙ্গিতে ফটিক তার মুখের পানে মুহূর্ত তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, তোমাকে তো আমি যেতে বলিনি।

—আর কেমন করে বলে? মুখ ফুটে বললেই কি বলা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস। যেতে যেতে কেষ্ট বললে, আমার জন্যে তোমাদের মনোমালিন্য, মালি মকদ্দমা হয় এ আমি চাই না। তার চেয়ে আমিই চলে যাবো। কাজ নেই আমার এই অশান্তির ঘর কন্নায়। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

কেষ্ট ধীরপায়ে দাওয়া থেকে নামছিল। ফটিক তারপানে চেয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বললে, আমি কি করবো বলো। তোমার ওপর যদি কেউ অন্যায় করে থাকে সে আমার ঠাকুর্দা।

পৈঠের উপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কেষ্ট দাঁতে ঠোঁট চেপে বললে, হ্যাঁ। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাই। যদি তুই আমায় সাহায্য করিস।

—আমি?

—হ্যাঁ তুই। তুই।

গলায় জোর দিয়ে কেষ্ট উত্তর দিল।

—কেমন করে?

মুখে আঁচল দিয়ে হাসির ঢেউ চাপল কেষ্ট। চোখে বিদ্যুৎ হেনে বললে, তাও বলতে হবে? মুয়ে আগুন। সাধে বলি টোপা কুল। টক্ জোঁদা। একটু যদি মিষ্টি রস আছে।

বলতে বলতে কেষ্ট আবার দাওয়ায় উঠে এলো। ফটিকের খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, এখন নয়। পরে বলবো।

ফটিক অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। কেষ্ট আবার একটা হাসির ঢেউ তুলে বললে, মুখের পানে চেয়ে কি দেখছিস? কুসমীর মত রসাল নয়। নারে?

—ধেৎ!

অলস ভঙ্গিতে কেষ্ট বললে, বিষ্টিতে ভিজে আর হিমে গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু চায়ের জল চাপাইগে। চা খাবি?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ফটিক বললে, দিও একটু।

—চিনি নেই কিন্তু। হরির লুটের বাতাসা দিয়ে খেতে হবে। বুড়োকে চিনির কথা বললে বলে ফটিককে বোলো।

ফটিক বললে, বললেই পারো।

কেষ্ট মধুর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বললে, তা জানি। মুখ ফুটে চাইলেই পাবো। কিন্তু সবই যদি ফটিক দেবে উনি আছেন কি করতে? কিল মারতে? মরণ দশা। মুয়ে আগুন।

উত্তরের দোরে আগল পড়ল। দখিন দুয়ার খুললো। আঁচল উড়িয়ে আতুর গায়ে আঁকাবাঁকা পায়ে মাতাল মেয়ের মতো হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো দখিন বাতাস। ভেলকি হাওয়ার ছোঁয়া লেগে পাতা-ঝরা গাছের ডগা ফুঁড়ে পল্লব গজাল। চিকন পাতার টোপর পরলো। মরা বাঁশবনে সবুজের জোয়ার লাগল। আমের মঞ্জরীতে গুটি ধরল। পলাস বনে আগুন লাগল। মাথায় ফাগ মেখে অশোক রাঙা হয়ে উঠলো। বনে বনে ফুল ফুটলো। মায়াবিনীর কুহক স্পর্শে পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠলো।

আকাশের রঙ বদলালো। সোনালি রোদে আকাশ ঝলমলিয়ে উঠল। সোনালি সবুজে জড়াজড়ি করে ধরিত্রীর ভোল বদলে দিল। দিনের চেহারা বদলে গেল। রাতের চেহারা বদলালো। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি এসে ভিড় জমায় ফুলে বনে। প্রজাপতি ফুলের রঙের সঙ্গে পাখার রঙের পাল্লা দেয়। গাছের ডালে ফিঙে নাচে। আড়াল থেকে দোয়েল শ্যামা গান ধরে। কোকিল লম্পট 'সাবাস' 'সাবাস' করে তাদের মুজরো দেখে বাহবা দেয়।

প্রকৃতির বুকে রস নেমেছে। শীতে জর্জর রুক্ষ রিক্ততায় রস-সঞ্চার হয়েছে। ধমনীতে রোমাঞ্চ জেগেছে। উগ্র তপস্বিনী হঠাৎ ভোগলিপ্সু হয়ে উঠেছে। রুক্ষ জটা আঁচড়ে তেল চকচকে করেছে। খড়িফোটা গায়ে ফুলের রেনু মেখেছে। গৈরিক বসন ছেড়ে সবুজে অঙ্গ ঢেকেছে। মোহিনী মায়ায় বসুধাকে ভোগাসক্ত করে তুলেছে। এ সৃষ্টির মায়া। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখবার জাদু মন্ত্র। উদ্ভিদ থেকে প্রাণীজগতের কেউই পারে না এর প্রবল প্রভাব এড়াতে।

এ এক বিস্ময়কর অনুভূতি। নতুনতরো আনন্দময় চেতনা। নারীর বুকে প্রথম দুগ্ধ সঞ্চারের মত তীব্র আনন্দদায়ক।

এর আকাশে বাতাসে জাগানী গান। ঘুমন্ত বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। মনকে নিরাবরণ করে দেয়। গভীর অন্তরে কি যেন উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়ে মনকে ভোগের সন্ধানে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। আর সব ভুলিয়ে দেয়। বিগত যৌবনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার অস্পষ্ট অতীত। নতুন করে তার মনে ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। তার অপগতপ্রায় যৌবনকে ধারালো করে তোলে। নতুন রসে তার বুক ভরে দেয়। আবার সে নতুন সন্তানের জননী হয়। চিরবাসা ভিখারীর মেয়ে কামনায় রাঙা হয়ে ওঠে। ভুলে যায় পেটের ধান্ধা। অন্নের চিন্তা।

এরি নাম বসন্তোৎসব। বছরের শ্রেষ্ঠ ঋতু এই বসন্ত। ভোগের অপর্যাপ্ত অর্ঘ নিয়ে আসে। মনের পায়ে ভোগের নূপুর পরিয়ে দেয়। চোখে সৌন্দর্যের অঞ্জন এঁকে দেয়। কখন কে যে সুন্দরের রূপ ধরে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় বোঝা শক্ত। কখন কার স্পর্শে কামনা বাসনার রুদ্ধ দরজার জানলাগুলো খুলে হাট হয়ে যায় কে বলতে পারে। পুরোণোকে নতুন মনে হয়। অপরূপ সুন্দর মনে হয়। অবাক হয়ে ভাবতে হয় এতো কাছে রয়েছে তবু এতোদিন চোখে পড়েনি কেন? অন্ধ হয়ে ছিলুম কেন?

ফটিকের ও তাই মনে হলো সে দিন হঠাৎ পথের মাঝে কেষ্টকে দেখে। রোজই যে কেষ্টকে সে দেখে, দিনে দুপুরে যাকে দেখে তার মাঝের এতো বৈচিত্র্য কোথায় লুকিয়ে ছিলো? এতোদিন চোখে পড়েনি কেন?

কেষ্ট বড় একটা দূরের পুকুরে চান করতে যায় না। বাড়ির কাছে চঁদে পুকুরেই চান করে। চন্দ্র বাবুদের পুকুর। চন্দ্র পুকুর না বলে চঁদে পুকুর বলে লোকে। পূর্ণকে ‘পুন্নু’ বলার মত। ভাল ঘাট ও দুটো ছিল এককালে। সান বাঁধানো ঘাট। এখন অবিশ্যি

ভাঙা নৌকোর মতো উপুর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেই ঘাটেই ওদের পাড়ার মেয়েরা চান করে।

ঘাটের মাথায় বিরাট একটা তেঁতুল গাছ। মেয়েদের চান করার কোন অসুবিধে নেই। সেদিন কিন্তু মণীন্দ্র মোড়লের বোনের সঙ্গে কেষ্টকে পালে পুকুরে যেতে হল। মনীন্দ্রর বোন কামিনী শ্বশুর বাড়ী পাঁড়ুই থেকে কদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসেছে। এসেই কেষ্টর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছে। কাজেই তার কথা ঠেলতে পারল না সে।

পালের পুকুর থেকে চান করে দুজনে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরছিল। দুজনেরি কাঁকে দুটি ঝকঝকে পিতলের ভরা কলসী। মাথার ভিজেচুল পিঠের উপর এলানো। কামিনী গাঁয়ের মেয়ে, তার মাথায় কাপড় দেবার বালাই নেই। কেষ্ট কিন্তু গাঁয়ের বউ। কাজেই ভিজে শাড়ির একটা আঁচল তুলে দিয়েছে মাথার উপর। শাড়ির ভিজে কালো পাড়টি মুখখানি ঘিরে গালের উপর লেপটে আছে তারই সঙ্গে নেমে গেছে তার ভিজে এলো চুল।

তখনকার দিনে মেয়েদের শাড়ির নিচে সায়া সেমিজ পরবার রেওয়াজ হয়নি। বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে চাষির ঘরে। তাই সিক্ত বসন তলে নিম্নাঙ্গের প্রকট দেহরেখাকে আবরণ দেবার জন্য ভেতরে পরেছে গামছা। কেষ্টর ভিজে সাদা শাড়ির নিচে নটকানে রঙের গামছার আবরনী তার গতিশীল সুঠাম শ্রোণীদুটিকে লীলায়িত করে তুলেছে।

দুজনেই তরুণী। তরুণীর মনের কথা আমরা কি জানি? কতটুকু বুঝি? তাদের মন গোপন। মনের কথার আষ্টেপৃষ্টে জিলিপীর প্যাঁচ। ওদের কথার প্যাঁচে পড়লে আর রক্ষে আছে। বিধাতা যা বোঝে না, আমরা তার কি বুঝবো? যখন তরুণী ছিল নিজের

একটিকে বুঝতেই ত্রিভুবন অন্ধকার দেখতে হয়েছে। কিন্তু অতঃপরম্।

কামিনী আর কেষ্ট। দুজনে বেশ মশগুল হয়ে হাসি গল্প করতে করতে হেলেদুলে পথ আলো করে চলেছিল। খিদ্মি তলায় আসতেই দেখা হলো ফটিকের সঙ্গে। ফটিক একটা নিমের দাঁতন মুখে দিয়ে এগিয়ে আসছিল। তাদের দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়াল। তার চোখ ঠিকরে গেল কেষ্টর পানে। দুজনের দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হলো। কেষ্ট মুচকে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কামিনীর পানে চাইল ফটিক।

কামিনী একগাল হেসে বললে, তোর নতুন ঠাকুমাকে পালে পুকুরে চান করতে নিয়ে গিয়েছিলুম। ও তো এখনো আমাদের গাঁয়ের কিছুই দেখেনি। পালে পুকুর দেখেই চমকে গেছে। বলে এতো বড়ো পুকুর? এ তো দিঘী? তবু এখনো "দত্তে পুকুর" "আড়ে পুকুর" দেখেনি।

ফটিক বললে, তা সত্যি। এক বর্ধমান শহর ছাড়া এতো বড়ো বড়ো পুকুর তো এ অঞ্চলের কোন গাঁয়ে নেই।

কেষ্ট চোখের কোণ দিয়ে ফটিকের মুখের পানে তাকাল। ফটিক অবাক হয়ে তার দিকে নতুন চোখে তাকাচ্ছে। সে কথা বলছে কামিনীর সঙ্গে কিন্তু তার লুব্ধ চোখ দুটো নির্লজ্জের মত কেষ্টর মুখের উপর ঘুর ঘুর করছে। কেষ্টর মনে খুশি উপচে পড়ে। এ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে মেয়েদের দেরী হয় না।

কামিনী বললে, এবার কিন্তু বেশ ঠাকু-মা হয়েছে তোর ফটিক। ঘর আলো করা রূপ। তা তুই এইবার দেখেশুনে এই রকম একটি ডাগর বউ ঘরে আন। আর কদ্দিন ধম্মের ষাঁড় হয়ে থাকবি?

ফটিক হাসল। শুকনো, কাষ্ঠ হাসি। তার মনের চোখ কেষ্টর সর্বাঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে। কেষ্ট মুখ ঘুরিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

এতো মিষ্টি করে হাসতে ও শিখলে কবে?

হাসতে হাসতে ফটিক শুকনো গলায় জবাব দিল, বিয়ে করে খাওয়াবো কি কামিনী পিসি? আমার আছে কি? কাল বুড়ো তাড়িয়ে দিলে পথে দাঁড়াতে হবে।

—ইস্! কেন তোর বাবার বাড়ি নয়? জমি জমা তোর কিছু নেই? আর তাড়িয়েই বা দেবে কেনে? তোকে কোলে পিটে করে মানুষ করলে।

একটু থেমে এ-দিক ও-দিক চেয়ে কামিনী চাপা গলায় বললে, তা এ বয়সে আর ঠাকুর্দা বিয়ে না করে এর সঙ্গে তোর বিয়ে দিলেই যেন ভাল হতো। বেশ মানাতো তোর সঙ্গে। মেয়েটারও আখের নষ্ট হতো না।

—ধ্যেৎ!

ফটিকের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। কেষ্ট কামিনীর গায়ে চিমটি কেটে হুস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। সে মুখ ঘুরিয়ে মাথার আঁচলটায় টান দিল। সলজ্জ ভঙ্গিতে।

ঠোঁট ফুলিয়ে কামিনী বললে, ইস্! ভারি নজ্জা। নাতি তো রসের সম্পক্ক লো। ওকে নজ্জা করলে বাঁচবি কি নিয়ে ঐ নঙ্কাপুরীতে? ওকে নেড়েচেড়েই ফষ্টিনষ্টি করে বাঁচতে হবে। বুড়োকে নিয়ে বুকচাপা রাত কাটিয়ে তবু একে নিয়ে হেসে খেলে দিনভোর হাঁপ ছাড়তে পারবি। এমন হাসিমুখো ছেলে দেখিসনে।

তির্যক ভঙ্গিতে ফটিকের পানে কটাক্ষ হেনে কেষ্ট কামিনীকে বললে, আমার অদেষ্টে তো এসে পয্যন্ত হাসিমুখ জোটেনি।

কামিনী বললে, কেন? ফটিককে ছেলেবেলা থেকে দেখে

আসছি। অমন ছেলে আমাদের পাড়ায় নেই। ওর সুখ্যাত গাঁয়ের সবার মুখে।

কামিনীর সঙ্গে কেষ্ট চলে গেল। ফটিক যেন একটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে। সে নড়তে পারল না। কেষ্ট তাকে বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেছে। বিস্ময় বই কি! সর্বক্ষণ যাকে দেখছে, সে হঠাৎ বিস্ময় হয়ে তার চোখ ঘুরিয়ে দিল। এতো সুন্দর কেষ্ট! এতো রূপ তার শরীরের কোথায় লুকিয়ে ছিল। এতো ফুল তার দেহে ফুটলো কবে? ফটিকের মনে হলো তার চেহারার ভোল বদলে গেছে। তার মুখের ছাঁদ বদলেছে। গালের উঁচু হাড়গুলো কখন ঢেকে গেছে। ভরা ভরা গাল চোখের ভাঙা কোল ভরতি ক'রে দিয়েছে। চোখে ফুটেছে নতুনতর আলো। এতো চুল! কালো চিকন চুলের ঢল পিঠ জুড়ে, কোমর ছাপিয়ে, পাছা ঢেকে দিয়েছে। একা চুল দিয়েই ও পুরুষকে বেঁধে রাখতে পারে। ওর সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের বন্যা। বুক ভরা ভরতি। বুকের মাঝখান থেকে থর নিয়ে পাহাড়ের চুড়োর মত উদ্ধত ভঙ্গিতে দুপাশ উঁচু হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর নিটোল বটফলের মত দুটি বোঁটা। সরু কোমর থেকে জঙ্ঘা ও শ্রেণীর অবতরণ রেখাগুলো পাথরের গায়ে ঝর্ণা ধারার মত উচ্ছল। উত্তরঙ্গ। পরিপুষ্ট শ্রোণীভারে চলা-ফেরার গমক বেড়েছে।

ফটিকের মনে হয় দেহ নয় যেন ফুলন্ত লতা। নতুন মেঘের বিদ্যুৎ শিখা।

কামিনীর পাশে কেষ্ট অপ্সরা। কামিনী ঝাপ্সা হয়ে গেছে। চাঁদের পাশে তারার মত মিটমিট করছে।

ফটিকের পাশ দিয়ে আরো এক ঝাঁক অল্পবয়সী মেয়ে কলসী কাঁকে চলে গেল। ফটিক তাদের পানে চেয়ে দেখল। দেখল,

তাদের দলে কেষ্টকে ভিড়িয়ে দিয়ে। কামিনীর মত এরাঁও কেষ্টর আলোয় ডুবে যায়।

অফুরন্ত অবসর। ফটিক নতুনঘরের দাওয়ায় বসে তবলার রেওয়াজ করছিল। তবলা এবং খোল্ বাজনায় তার হাত আছে। চেটাই-এর ওপর একখানা কম্বল বিছানো। তারি ওপর বাঁয়াটা কোলে নিয়ে উবু হয়ে বসে ফটিক একমনে তবলায় সঙ্গত করছিল।

উঠোনটা রোদে ভরে গেছে। দেয়ালের ধারে একটা ঝাঁকরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। লাল ফুলগুলো রোদে জ্বলছে। সবুজ চিকণ পাতাগুলো নতুন বসন্তের অস্থির হাওয়া লেগে দুলছে। যেন ঘন সবুজ শাড়ি-পরা কোন মেয়ে লাল গামছায় মাথা ঢেকে হাসছে। সজনে গাছের মাথায় কাক ডাকাডাকি করছে। সজনের ফুল প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। মেটুলি সাপের মত কচি কচি ডাঁটাগুলো হাওয়া লেগে কিল্‌কিল্ করছে। কুলগুলোয় পাক ধরেছে। পাকা কুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। পাশের বাঁশ ঝাড়ের ডগায় বসে একটা শঙ্খচিল ডাকছে। কাকে ডাকছে সেই জানে। হাওয়ায় নতুন বসন্তের ছোঁয়া লেগে সবাইকে যেন উতল করে তুলেছে সাথির অভাবে।

ফটিক আনমনা। জানতে পারে নেই কখন জেলেদের কুসুম এসে দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। কুসুমের আঁটসাট দেহ শাড়ির বেড়ে জড়ানো। পাছাপাড় শাড়ি নিবিড় করে তার অঙ্গটাকে আঁকড়ে ধরেছে। কোমরে কষি দিয়ে আঁচল জড়ানো। হাঁটুর কাছ পর্য্যন্ত শাড়িখানা উঁচু করে তোলা। পা দুটো কাদামাখা। হাতে একটা মাছের ফলুই। গায়ে আঁশের গন্ধ। মৎসগন্ধার গন্ধ পেয়েই বোধ হয় ফটিক চোখ তুলে তাকাল। দুজনে চোখোচোখি হলো। শিটকে উঠলো ফটিক। কুসুম হাসল। কুসুমের হাসিটা পাঁচ-

মিশেলী। রাগ ও অভিমানের হাসি। কিছুটা ঈর্ষাকাতর ও অভিযোগের। তবে করুণাও আছে বই কি.প্রচুর। আশা তো সে হারায়নি। এটা তার উপরি পাওনা। তবু দাবি ছাড়তে কে চায়।

ফটিক ভগ্নভঙ্গিতে তার পানে চেয়ে করুণ স্বরে প্রশ্ন করলে, কি রে?

কুসুম চোখে বিদ্যুত ছড়িয়ে বললে, দাদা চঁদে পুকুরে মাছ ধরছে। অনেক খয়রা মাছ উঠেছে তাই কিছু দিয়ে গেনু। ভাজা খাস্।

ফটিক ঠোঁক গিলে, আমতা আমতা করে বললে, তা পয়সা দিয়েছে? না—

কুসুম এদিক্ ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললে, আঁ মরণ! পয়সা নিতেই তো তোর কাছে এয়েছি। তোর রসের ঠাকুমা তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে যে।

ফটিক করুণ ভঙ্গিতে তাকে থামতে ইশারা করলে। একবার ভয়ার্ত চকিত দৃষ্টিতে ভেতর বাড়ির দিকে তাকাল।

কুসুম মুখে আঁচলের খুঁট দিয়ে হাসি চাপল। হাসি থামিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আ মরণ! এতো ভয়? তবু বউ নয়। মাও নয়। ঠাকুমা।

—তা হলেও—

—মরেছো। তাই বলি ফটিকদা হঠাৎ ডুমুরের ফুল হয়ে গেল যে। আমাদের পাড়া মুখো হয় না কেন?

—চোপ্। দুষ্টুমি করিস্ নি। চেঁচাস নে ভাই। দাঁড়া, পয়সা এনে দিচ্ছি।

আরেকটা হাসির ঢেউ তুলে কুসুম বললে, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। পয়সা বাকি রইল। বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসিস্।

ক্ষিপ্রছন্দে হাসতে হাসতে কুসুম উঠোন পেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ফটিক একটা খুঁটি ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক পরে আবার হাসির শব্দ। এবার পেছনে। ফটিক চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বাড়ির দিকের দাওয়ার নিচে কেষ্ট দাঁড়িয়ে হাসছে।

—কী অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

ফটিক অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে অপরিসীম লজ্জায় মাথা হেঁট করল। ধরা পড়ার লজ্জায়। তার মুখখানা প্রায় কাঁদ কাঁদ। তার মুখ দেখে কেষ্টর হাসি পেল এবং করুণাও হলো। সে হাসি চেপে কাছে গিয়ে আশ্বাসভরা কণ্ঠে বললে, লজ্জাটা কিসের যে মুষড়ে ভেঙ্গে পড়লি? পরের মুখে আমরা হাত চাপা দোব কেমন করে? ওদের মুখ আছে ওরা বলবে। আমরা কান দিয়ে শুনে যাবো আর মনে মনে হাসবো। তা ছাড়া আর কি করতে পারি বল্? পুরুষ মানুষ তার জন্যে আবার লাজলজ্জা কি? লোকে বলবে আর তুই বুক ফুলিয়ে চলে যাবি তবে না মরদ?

ফটিক নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কেষ্ট বললে, আয় নেমে আয়। জলখাবার বেলা কখন উৎরে গেছে। খাবি আয়।

কেষ্টর গলা মমতা আর করুণায় আচ্ছন্ন। ফটিকের কানে মধুর হয়ে বাজলো। সে চোখ তুলে কেষ্টর মুখপানে তাকাল। অসহায়ের মত।

কেষ্ট মৃদুরেখায় হাসলো। বললে, দূর্ ওর কথা আবার ধরতে আছে। মেয়েটা পাগলি। ভারি বেহায়া আর মুখপাতলা। তবে মনটা সাদা।

ফটিক এতোক্ষণে কথা বলল : না না। ওকে তুমি আস্কারা দিও না। ওর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই।

কেষ্ট তেরছা চোখে ঝলকানি দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তাইতো! আমিই তো ওকে আস্কারা দিই! আমার সঙ্গে ওর প্রোণয় পিরীত যে।

ফটিক হেসে ফেললে। লজ্জালু ভঙ্গিতে বললে, প্রণয় পিরীত না ছাই। ঐ আমার পেছু ছাড়ে না।

কেষ্ট বললে, তা কি করবে বল মনে ধরেছে। এমন সোন্দর জোয়ান পুরুষ! মেয়ে মানুষের মনে ধরলেই মুস্কিল!

বাঁকা ছুরির মত ধারালো হাসি কেষ্টর ঠোঁটে। ফটিকের বুকের নিচেটা থরথর করে।

রুদ্ধশ্বাসে শ্রান্তের মত কেষ্টর পেছনে পেছনে গিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় ওঠে ফটিক।

কেষ্ট ঘরের শিকল খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে, মুড়ি ভিজিয়ে খাবি না শুকনো খাবি? ঘোল আছে। আজ সর রয়েছি।

চাষির ঘরের জলখাবার মুড়ি, একথাবা গুড় আর দুধ। দুধের বিকল্পে জল।

ফটিক নিকোনো দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বলে, যা খুসি দাও।

কেষ্ট দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, ইস! বলিস কি? আমার খুসিতেই তোর খুসি। আজ কার মুখ দেখে উঠেছি। আমার অদেষ্ট ভাল তো! যাক মুখ ফুটে যে বলেছিস সেই ভাল।

ফটিক তার পানে মুখ তুলে বললে, তোমার কেবল ঠাট্টা।

—কী করবো বল। আমাদের সম্পক্কটা যে ঠাট্টার। শুনলি তো সকালে কামিনী মেয়ে কি বললে?

ফটিক বললে, আজ সকাল থেকে ঐ কথাই শুনছি।

কেষ্ট চাঁচে মুড়ি ঢাকিতে ঢালতে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসির তোড় থামলে রাঙা-মুখে বললে, ঠিক বলেছিস। আজ সকাল থেকে ঐ এক কথা সবার মুখে। পুকুর ঘাটে একদল মেয়ে মায় গিন্নীরা পর্যন্ত সকলে আমাকে ঘিরে কনে দেখার মত চেকে চেকে দেখলে আর বললে, তা বুড়ো একে নাতবউ করলে না কেন? নাতির সঙ্গে তো মানাতো। নাতির বিয়ে দেবার নাম নেই। নাতনির বয়সী একটা মেয়েকে নিজে বিয়ে করে এলো।

ফটিক লজ্জারাঙা আনত মুখে নিঃশব্দে হাসল।

কেষ্ট বললে, আর তোর ঠাকুর্দাকে তো যতো পারলে গাল দিলে। বীরমল্লিক, ভাঁড়গোপ তোদের গাঁয়ের শ্মশানগুলোর ছাই নামও মনে থাকে না, সেইখানে পাঠিয়ে দিল।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, আর তুমি কিছু করলে না?

—আমি আবার কী করবো? জিজ্ঞাসু চোখে কেষ্ট ফটিকের মুখপানে তাকাল।

ফটিক গম্ভীর হয়ে বললে, স্বামীর নিন্দে শুনে দক্ষযজ্ঞের সতীর মত প্রাণত্যাগ করলে না? অমন মহাদেবের মতো স্বামী। সইতে পারলে তার নিন্দে?

—ওঃ! তাই বটে। তুই কাছে থাকলে, গলায় কলসীটা বেঁধে দিতে বলতুম।

দুজনে একসঙ্গে হাসল।

কেষ্টর বুঝতে বাকি রইল না যে ফটিক আজ তার ওপর প্রসন্ন। কিন্তু কেন? হঠাৎ?

খেতে দিয়ে কেষ্ট বারবার তার মুখের পানে চেয়ে প্রশ্নের জবাব

খুঁজতে লাগল। সে কেমন করে বুঝবে যে এর মাঝে আছে অদৃশ্য হাতের কারসাজি। ফটিকের আজ খিন্নি তলার পথে দেখে পর্যন্ত কেষ্টকে ভারি ভালো লেগেছে। সে ভালো-লাগার মাঝে নিজের হাত নেই। সব কিছু ফাগুন হাওয়ার আর ফাগুনের রসিক দেবতার মারপ্যাঁচ।

॥ চার ॥

শিবকে বাদ দিয়ে এতোক্ষণ শিবের গান গাইছিলুম। যে গ্রামের কাহিনী বলতে বসেছি তার নামটা পর্যন্ত এখনো বলা হয়নি। গ্রামের নাম পলাশী। শুধু পলাশী নয়। সোনা পলাশী। কানা ছেলের নাম যদি পদ্মলোচন হয় তাহলে সোনাপলাশী নামও সার্থক হয়েছে। কেন এবং কে যে এই-গাঁয়ের নাম সোনাপলাশী দিয়েছিল সেটা অবশ্য গবেষণার বিষয়বস্তু। উপন্যাসকারের এলেকা নয়। সেটা নিছক অবান্তর। তবে একটা কারণ আমাদের জানা আছে। বলতে বাধা নেই। গ্রামটা স্বুবর্ণ বনিক বা সোনার বেনে অধ্যুষিত। ধনী ও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন বহু প্রতিপত্তিশালী স্বুবর্ণ বনিকের বাস ছিল এককালে এই গ্রামে। এবং প্রতিবেশী গ্রাম বলগোনা, কুড়মুন ও গোবিন্দপুর হয়তো সোনার বেনের গ্রাম বলেই এর নামের আগে 'সোনা' কথাটা কেউ যুক্ত করে দিয়েছিল। তবে এককালে গ্রাম যে সমৃদ্ধ ছিল তার বহু নিদর্শন ও স্মারক-চিহ্ন এখনো গ্রামের পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে। বহু দেবমন্দির, বহু দোলমঞ্চ, বহু-বিস্তৃত দীর্ঘিকা, গ্রামের পুণ্যকামী ও সদাশয় পূর্বতন বাসিন্দাদের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। তা ছাড়া গ্রামের প্রচলিত পাল পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান থেকে গ্রামের সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এযুগে আদিম ও বন্য মনে হলেও গ্রামবাসীরা আজো সে-সব উৎসব অনুষ্ঠানকে মান্য করে চলেছে।

পলাশীর বুড়োশিব জাগ্রত দেবতা। কত তাঁর বয়স, কবে হিমালয় থেকে তাঁর তৃতীয় নয়নের আলো ছিটকে পড়েছিল এই

গ্রামটির উপর, কোন মহাপুরুষ তাঁকে এই শিবতলায় মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেউ জানে না। তার কোন দলিল দস্তাবেজও নেই। তবে তিনি বহুকাল আছেন এই গ্রামে। এই গ্রামেই বুড়ো হয়েছেন। আদ্দিকালের বদ্যি বুড়ো। গ্রামের লোকে তাঁর পুজো করে। নিত্য সেবা করে। চোৎ মাসে সমারোহ করে গাজন উৎসব করে। তাঁর নিজস্ব জমিজমা আছে। তাঁর মন্দির আছে গ্রামের মধ্যস্থলে। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির আছে। সামনে বিস্তৃত চত্বর। অন্যদিকে আরেকটি শিবমন্দির। তবে তিনি বুড়ো নন। বোধ হয় একই সময় রেষারেষি করে বুড়োশিবের সামনে আর কেউ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিংবা হতেও পারে একই লোক একসঙ্গে ডবল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। শিবের উপর তখনকার দিনে লোকের প্রচুর ভক্তি আস্থা ছিল। একসঙ্গে একশো আট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বর্ধমানের এক মহা রাজা। তাও একজায়গায় নয়। বর্ধমানে এবং কালনায় দু জায়গায়। রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কোন্নগরের গঙ্গাতীরেও দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। কাজেই এও হতে পারে পলাশীতে একই লোক একই সময়ে সামনাসামনি দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে বুড়ো বাবার সঙ্গে সামনের শিব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাত্তা পায় নেই। গ্রামে আরও বহু শিব আছে। কেউই পাত্তা পায়নি। একা বুড়োশিবের জয়গানেই গ্রাম মুখরিত। অন্য সব শিব ঝিমিয়ে পড়েছেন। পড়বেন বইকি। যাঁরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখেননি, পাছে মন্দিরে আলো দিয়ে তাদের বিব্রত করে।

বুড়ো হলেও একা বুড়োশিবই জেগে আছেন অথবা গ্রামবাসীদের আর্তনাদে ঘুমোতে পারেন না। তিনি তো কারুর

একার নন। তিনি সর্বজনীন। সর্বজনীন বলেই বোধ হয় গ্রামটা এখনো টিঁকে আছে। তিনটে চোখে একসঙ্গে আর কতজনের উপর দৃষ্টি দেবেন? নইলে এতোদিন তাঁকে কষ্ট করে লোকালয়ে বাস করতে হতো না।

শিবতলার চত্বরের চারিপাশে এককালে পাকা বাড়ি ছিল। শুধু পাকা নয়। দোমহলা দোতলা প্রাসাদ ছিল। সিং দরোজা বিরাট ফটক ছিল জমিদার জীবন মিশ্রের। কিন্তু বাবা বুড়ো শিবের টনক নড়ল। তিনি শ্মশান ছেড়ে গ্রামে এসেছেন বলে অতো ঝামেলা আর বুকচাপা আড়াল তাঁর সহ্য হবে কেন? ধীরে ধীরে সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কোঠা ঘরের ছাদ সরে গিয়ে খড়ের চাল হচ্ছে। ইটের দেয়াল ভেঙে মাটির দেয়াল হচ্ছে। শিবতলা বেশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তাণ্ডবের জায়গা চাই তো বাবা বুড়ো শিবের।

আর এই শিবতলায় যত জন জটলা। হৈ হুল্লোড়। যত আনন্দ অনুষ্ঠান। যাত্রা থিয়েটার। বাদাই-তরজা। সালিশী পঞ্চায়েৎ। বারোয়ারী। গাজনের থাকা। গাজনের মেলা। স্বদেশী মিটিং পর্যন্ত।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই শিবতলা।

নিরিবিলির ঠাকুর ভোলানাথের কান ঝালাপালা। নেশার মৌতাত জমে না।

চোৎ মাস পড়তেই ঢাকে কাঠি পড়ল। গ্রাম মেতে উঠল। বুড়োশিবের গাজন। এ অঞ্চলের বহু প্রাচীন ও প্রচলিত উৎসব। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে, শহর থেকে দেশ বিদেশের লোক আসে পলাশীর গাজন দেখতে। বৈশিষ্ট্য আছে এখানকার গাজনের। শিবতলায় থাকা হয় পুরোণো কলকাতার লোহাপটির সঙের মত।

থাকা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে পাড়ায় পাড়ায়। দক্ষিণ পুব ও পশ্চিম পাড়া একজোট হয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করে উত্তরপাড়ার সঙ্গে। আবহমানকাল ধরে এদের এই প্রতিদ্বন্দিতা। দু'দলে কোন কালেই মিল নেই। উত্তরপাড়ায় অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের বাস। দুএক ঘর কায়স্থ ও বাকি চাষি। ব্রাহ্মণরা শক্তি উপাসক। দক্ষিণ-পাড়ায় ক-ঘর গোঁসাই-এর বাস। তাঁদের প্রভাবে এ তিন পাড়া বৈষ্ণব মতাবলম্বী। সোনার বেনেরা তো পুরোপুরি বৈষ্ণব এবং অধিকাংশই গ্রামের গোঁসাইদের শিষ্য।

উত্তরপাড়ার ব্রাহ্মণরাই কিছুটা অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী। এদিকে সোনার বেনে এবং তাদের ব্রাহ্মণদেরই প্রভাব বেশী।

এই দুইদলের মনোমালিন্য ও রেষারেষি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে এই রকম উৎসব অনুষ্ঠানে। এ পাড়ার দেখাদেখি ও পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ে উঠল। নতুন স্টেজ তৈরি হলো। এ পাড়ার গাজনের থাকার সঙ্গে ও-পাড়া পাল্লা দিল।

যাক। এ নতুন নয়। বাঙলার সর্বত্র এই দলাদলি রেষারেষি। যেখানেই দল সেইখানেই দলাদলি। তা ছাড়া প্রতিযোগিতা বা কমপিটিশনের কিছুটা মূল্য আছে বই কি! কমপিটিশনের দোহাই দিয়ে সংসারে অনেক বড় কাজ সাধিত হয়েছে। তার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামের দুদলে এই প্রতিযোগিতা না থাকলে গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানে ভাটা পড়ে যেতো। এতো জোরালো হতো না। উসকে না দিলে তো শিখা বাড়ে না। বাইরের রেষারেষি ভিতরের গতিবেগ বাড়ায়। উদ্যম আনে।

মিলিত প্রচেষ্টার সার্থকতা সুস্পষ্ট। অমিলিত প্রচেষ্টার সার্থকতা অস্পষ্ট এবং ঝাপসা হলেও একেবারে নিরর্থক নয়।

দুপক্ষের অমিলিত প্রচেষ্টায় গাজনের মস্ত হয়। মেলা বসে। আটখানার জায়গায় বারোখানা ঢাক আসে। দগড় শানাই আসে। সন্ন্যাসীদের মালার ও মরার মাথার প্রতিযোগিতা বাড়ে।

সন্ন্যাসীর মালা রচনা। গ্রামের একটা নিজস্ব শিল্প। তার বৈশিষ্ট্য আছে। বৈচিত্র্য আছে। দিস্তে দিস্তে কাগজ বিভিন্ন রঙে ছুপিয়ে তার ফুল তৈরী হয়। সবুজরঙে ছোপান টুকরো শোলা কেটে হয় সেই ফুলের বোঁটা। সেই ফুলের মালা গেঁথে হয় গাজনের সন্ন্যাসীর গলার মালা। প্রতি সন্ন্যাসীর তিন চার গাছা মালা। মাথায়ও তেমনি মালা। এ মালার মাঝে সূক্ষ্ম কলা'ও কারুকার্য আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই মালা গড়ে। প্রতি বাড়িতে, প্রতি সংসারে সন্ন্যাসীদের সাজবার বরাদ্দ আছে। কাজেই ঘরে ঘরে এই মালা রচনা গাজনের একটা বিশেষ অঙ্গ। এই মালার প্রতিযোগিতা হয় শিবতলায় বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের আসরে।

বাঁশ, কাঠ, খড় মাটিতে শিবতলা ভরে গেছে। নবদ্বীপ থেকে পোটো এসেছে থাকার পুতুল গড়তে। মালি এসেছে পুতুলের রাংতার সাজ গড়তে। দত্তদের চণ্ডিমণ্ডপে পুতুল রঙ হবে। সাজসজ্জা পরান হবে। তারপর থাকা সাজানো হবে।

খিন্নিতলার গাজনের দিন থেকে মেলা শুরু হবে। সেই দিন প্রকাশ্য ভাবে দর্শকদের জন্য থাকা উন্মুক্ত করা হবে রীতিমত ঢাক ঢোল দগড় বাজিয়ে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান করে।

হ্যাসাক আর কারবাইড জ্বেলে থাকা আলো করা হবে। থাকার গায়ে বড় বড় অক্ষরে পাড়ার নাম ঘোষনা করা থাকবে।

চণ্ডিমণ্ডপে বসে মালার কাগজ ছোপাতে ছোপাতে ফটিক

কেষ্টর কাছে গাজনের মেলার ফিরিস্তি দেয়। কেষ্ট হাঁ করে তার মুখপানে চেয়ে শোনে।

ফটিক বলে, দাওনা ছখানা কাগজ ছুপিয়ে। কী আর এমন শক্ত কাজ! ন্যাকড়ার থুপি ভিজিয়ে কাগজের ওপর বুলিয়ে দেওয়া। শুধু দেখবে যেন ছ্যাব্‌ড়া না হয়।

কেষ্ট বলে, এখন রাখনা। দুপুরে বরঞ্চ তুই দেখিয়ে দিস। আমি করে দোব'খন। এখন খাবি চল।

—বাসরে! দুপুরে কি আমার একটু ফুরসৎ আছে নাকি। আমার ওপর কত ভার তাতো জানো না। ঐ পটো মিস্ত্রীদের সব খাওয়াতে হবে। বামুনদের মল্লিকে পিসী রান্না করছে। তারপর ওদের জোগান দেওয়া, বাঁশ, দড়ি, খড়। চা বিড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া—

কেষ্ট মুখ ভার করে, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোর তো আর টিকি দেখবার জো নেই। শিবতলাই হয়েছে ঘর। খাওয়া দাওয়া নেই দিনরাত টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

ফটিক মুখতুলে বললে, তা তুমি উঠলে কেন, একটু বসোনা।

কেষ্টর মুখে প্রসন্ন হাসি। মৃদু হেসে বললে, আমার উনুন জ্বলে যাচ্ছে। রাঁধতে হবে না?

—হুঁ! তোমার ঐ কাজ আর কাজ! যাও। তবে এইখানে ছুটি তেল মেখে মুড়ি দিয়ে যাও।

কেষ্টর মনে দোলা লাগে ফটিকের ছেলেমানষী হাবভাবে। তার স্নেহভেজা আদরের কণ্ঠস্বরে। সে লুব্ধদৃষ্টিতে তার বাঁকা ধনুকের মত ঝুঁকে-পড়া ভঙ্গিটির পানে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ও বুঝি বুকের তলা থেকে বেরিয়ে আসে।

এক থালা মুড়ির ওপর ছুটো মিষ্টি আর এক ঘটি জল তার সামনে রেখে কেষ্ট বললে, আজ ময়রার দোকানে অনেক মিষ্টি সাজিয়েছে। তাই তোর জন্যে কিনে আনলুম।

ফটিক হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললে, আমার জন্যে না তোমার বুড়োর জন্যে?

কেষ্ট এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে মধুর ভঙ্গিতে জবাব দিল, তোকে দিয়ে থুয়ে যদি কিছু থাকে তো বুড়ো পাবে।

—তাই নাকি? আমি তো জানি বুড়োকে দিয়ে যদি ধুলো গুঁড়ো কিছু থাকে তবেই আমার ভাগ্যে জুটবে।

কেষ্টর চোখে আগুনের ঝলকানি, ঠোঁটের হাসিতে ছুরির ধারালো ফলা। সাদা ঝকঝকে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সে বললে, তুই চাস কই? আমিই তো জুগিয়ে রাখি।

ফটিক একডেলা গুড়ছোলায় কামড় দিতে দিতে বললে, আমি তোমার বুড়োর মতো হ্যাংলা নই।

—তা ঠিক।

কেষ্ট হেসে উলটিপালোটি। ফটিক তার সঙ্গে হাসতে হাসতে বললে, এ সব কী কিনেছো? এই গুড়ছোলা আর গুড়ের মেঠাই। আমাদের গাঁয়ের আসল মিষ্টিই দেখোনি।

—সে আবার কি?

—খাজা। খাজা! পলাশীর খাজা বিখ্যাত। দেশ বিদেশের লোকে কিনে নিয়ে যায়। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানার মতো। কলকাতার লাহা বাড়ি, মল্লিক বাড়ি। হরেন শীলের বাড়ি পর্যন্ত যায়।

—কই দেখলুম না তো?

ফটিক বললে, আচ্ছা আজই আমি নিয়ে আসবো।

—হয়তো এখনো তৈরি করেনি।

—আমাদের এই চৌমাথার হৃদয় ময়রার দোকানে তৈরি করতে দেখেছি। এখন তৈরি করবে না তো কবে করবে! এই তো ওদের মরশুম।

রাধে গোবিন্দ! জয় রাধে!

বাইরে ভক্তর গলা শোনা গেল।

উৎকর্ণ হয়ে দুজনে বাইরের পানে তাকাল।

—কইরে রাই কোথায় গেলি? ও কেষ্টকলি! একটু আগুন দিয়ে যা।

বাঁকা চোখে কেষ্ট বললে, যাই। ওর মুখে আগুন দিয়ে আসি।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, ও সব ঢঙ! সাড়া নিয়ে দেখছে ফটকের কাছে গেল কিনা!

মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে কেষ্ট বললে, তাও তুই বুঝিস? তুই মিটমিটে সয়তান!

ফটিক চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, আমি নই। তোমার ঐ বুড়ো। ঐ ভক্ত বিঠেল।

জলোচ্ছ্বাসের মত একটা হাসির তরঙ্গ তুলে কেষ্ট দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যবারের চেয়ে এবছর গাজনে ধূম বেশী। গাজনের সঙ্গে গুড্ ফ্রাইডের ছুটি। কলকাতার বাবুরা, অর্থাৎ গাঁয়ের যে সব ভদ্রলোকেরা কলকাতায় চাকরি বাকরি করে, চারদিনের ছুটি পেয়েছে। বাবুরা সব বাড়ি আসছে। সঙ্গে আসছে বহু ভদ্র লোক। গাজনের মধ্যেই উপোসের রাত্রে বাবুদের থিয়েটার। সন্ন্যাসীদের রাত জাগার সুবিধে হবে থিয়েটার দেখে।

ফটিক উত্তেজিত স্বরে কেষ্টকে বলে, দেখবে আমাদের গাঁয়ের থিয়েটার। চোখ কপালে উঠে যাবে। গাঁয়ে কেন, শহরেও এমন থিয়েটার হয় না। জয়দেব পালা হবে। ঐ কেঁদুলীর জয়দেব। যেখানে মেলা হয়। গানের ফোয়ারা উড়ে যাবে। সব কেত্তন গান। কলকাতা থেকে একজন বড় গাইয়ে আসছে 'পরাশর' সাজবে। মস্তবড় ব্যাঙ্কের অফসার। নগেন চাটুজ্জে নাম। আর দ্বিজেন মিচ্ছিরি জয়দেব সাজবে। আমাদের গাঁয়ের লোক। ঐ শিবতলায় ফটকের ভেতর বাড়ি। এখানে একতোলা ধড়ধড়ে বাড়ি হলে কি হবে। কলকাতায় নিজের মস্ত বাড়ি। খুব বড় লোক। চেহারা দেখো মাইরি। রাজপুত্তুর।

—তাই নাকি? তা কে কি সাজবে, কি পালা হবে, এতোখবর তুই পেলি কোত্থেকে? কলকাতা ঘুরে এলি নাকি?

—ধেৎ তেরি!

ফটিক বিরক্ত হয়ে বললে, কলকাতা ঘুরে আসতে হবে কেন, আমাদের শিবতলাই কোলকাতা। মিচ্ছিরিদের পানু ঠাকুর সকালে কোলকাতা থেকে এসেছে। নবদ্বীপ গোঁসাইকে সব বলছিল।

তার উৎসাহ নিভিয়ে দেবার ইচ্ছে হলো না কেষ্টর। সে হাসিমুখে সহিষ্ণু শ্রোতার মত উৎসুক কণ্ঠে বললে, ওঃ! তাই বল। সেইখানে শুনে এলি? আমি বুঝবো কেমন করে? তা হলে খুব ধুমের থিয়েটার হবে বল?

ফটিকের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে গম্ভীর হয়ে বললে, যা শুনে এলুম বিরাট ব্যাপার। বিপিন জেলের পোষাক আসছে। কলকাতার সব চেয়ে ভালো পোষাক। ড্রেসার, পেন্টার আসছে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কাকে বলে, আমায় বুঝিয়ে বল?

—ধেত্তেরি। ড্রেসার পেন্টার জানো না? তুমি একদম জংলী চাষার মেয়ে।

কেষ্ট মুখটিপে হাসতে হাসতে বললে, সত্যিই তাই। নইলে তোর ঠাকুবাবার মতো আকাঠ গাঁওয়ারের পাল্লায় পড়ি।

মুহূর্ত ফটিকের চিন্তাধারায় ছেদ পড়ে গেল। চলতে চলতে হঠাৎ হোঁচট খাওয়ার মতো। সে বিষণ্ণ মুখে কেষ্টর মুখপানে চেয়ে ব্যথিতকণ্ঠে বললে, সত্যি সজনে ফুল, মাঝে মাঝে ঐ কথাটা আমিও ভাবি। চোখ চেয়ে ছিলে না কানা হয়ে গিয়েছিলে?

কেষ্ট তার সমবেদনা ভরা মুখের পানে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বললে, থাকগে। যেতে দে ও কথা। যা বলছিলি তাই বল।

ফটিক আবার ছেঁড়া সুতোর খেই ধরে হাসতে হাসতে বললে, ড্রেসার হচ্ছে যারা পোষাক পরায় বা সাজায়। আর পেন্টার হলো যারা মুখে রঙ মাখায়।

কেষ্ট যেন ভাবের ঘোরে মাথা নাড়ল। সে অচৈতন্যর মত নিমেষহীন চোখে চেয়ে আছে ফটিকের মুখের পানে। ফটিকের সেদিকে লক্ষ্য ছিল কিনা কে জানে। তবে কেষ্টর বুকের নিচে কামারের হাপর চলছিল।

ফটিক গভীর উৎসাহে বলে গেল, সিন সিফটার আসবে। আবার সখির ব্যাচ আসবে।

—মেয়ে নাকি?

—দূর! ছোট ছোট নাচিয়ে ছেলে।

—ওঃ!

কেষ্ট যেন কেমন ঝিমিয়ে গেছে। তার ভঙ্গিটা কেমন বেমানান। হাত পা ছেড়ে দিয়ে অথৈ জলে ভাসার মতো।

ফটিক বলে, একজন ভালো বেয়ালা বাজিয়ে আসছে। তারপর আমাদের গাঁয়ের কন্‌সার্ট আছে। ছ'খানা এস্রাজ। হারমোনিয়ম। আর ঠাকুদ্দার বাঁশী—

—ঠাকুর্দা ?

—ঠাকুর্দার বাঁশী শুনলে মাইরি ভুলতে পারবে না। আর জগাই পালের এস্‌রাজ তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

—এ অন্য ঠাকুর্দা ? রক্ষে করো। আমি ঠাকুর্দা শুনেই চমকে উঠেছিলুম।

ফটিক হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে উঠলো, তুমি কি ভেবেছিলে আমার ঠাকুর্দা ? তা ভাববে বই কি ? তোমার তো ও ছাড়া কোন ভাবনা নেই। ওই তোমার ধ্যান গেয়ান। ওই তোমার জপমালা। এতোই যদি পিরীত দিনরাত কাছে কাছে থাকলেই পারো। চোখ ছাড়া করো কেন ?

প্রথমটা কেষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই কিন্তু সে হেসে গড়িয়ে পড়ল। কেষ্ট তাকে রাগাবার জন্যেই হাসতে হাসতে বললে, না ভেবে উপায় কি বল। বুড়ো মানুষ আঁচল ছাড়তে চায় না। আর সত্যি কথা বুড়োরা ভালোবাসতে জানে। একটু যত্ন আত্তি পেলেই গোলাম হয়ে থাকে।

ফটিক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হুমকি দিয়ে উঠল, আমি জানি জানি তুমি কি মতলবে এখানে আসো। আমার মনের কথা বের করে নিয়ে বুড়োর মন বিষিয়ে দাও।

কেষ্ট তবু হাসে খিল খিল করে। সে হাসতে হাসতে তার কাছে

সরে গিয়ে মধুর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, কিন্তু তুই হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠলি কেন বলতো ?

ফটিক মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কম্পিত গলায় বললে, আর বলতে হবে না। এখান থেকে সরে যাও কেষ্ট। ঢের বেহায়াপণা দেখিয়েছো।

আজ প্রথম ফটিক কেষ্টকে নাম ধরে ডাকল। কেষ্ট চমকে গেলেও মনে মনে খুশি হলো। সে ফটিকের আরো কাছে সরে গিয়ে বললে, আমি বেহায়া ? আমায় সরে যেতে বলছিস ? কেন আমাকে তোর ভাল লাগে না ?

—না। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।

খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে, কেষ্ট তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বলে উঠলো, কখখনো নয়। তুই আমায় ভালোবাসিস।

ফটিক রাগে অন্ধ। কেষ্টর স্পর্শের কুহকে দিশাহারা। সে ছটফট করতে করতে বললে, না না। আমার হাত ছেড়ে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে যাও তুমি। যাও—

একটা ঝটকা দিয়ে কেষ্টর হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তার গায়ে একটা সজোরে ধাক্কা দিল ফটিক।

চাষির ঘর। দরজার একপাশে ঠেসানো ছিল একজোড়া গোরুর গাড়ির চাকা। কেষ্ট টাল সামলাতে পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ল সেই চাকার উপর। গালের পাশটা ছেঁচে গেল। কপালটা কেটে চোখের উপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

ফটিক হতভম্ব। কেষ্ট কপালে আঁচলের খুঁট চেপে উঠে দাঁড়াল। আঁচলটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। ফটিক তার রক্ত দেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কেষ্ট চোখের উপর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে তার পানে চেয়ে মৃদু হাসল।

ফটিক সাহস পেয়ে বলে উঠলো, আগে আমার সঙ্গে এসো। পরে যত পারো হেসো কিংবা যা খুশি করো।

ফটিক একরকম টানতে টানতে তাকে ঋষি ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কপালে বেনজিন কম্পাউণ্ড আর গালে আইডিন দিয়ে নিয়ে এলো।

ডাক্তার বাবুকে এবং পথে আরেকটি প্রৌঢ়া গিন্নীকে অম্লানবদনে কেষ্ট বললে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিনু।

ভক্ত বাড়িতে ছিল না।

বাড়ি ফিরে ফটিক জিজ্ঞেস করলে, বুড়োকে কি বলবে?

কেষ্ট তাকে চোখের কোণ দিয়ে শাসিয়ে বললে, বলবো ফটিক মেরে আমার গতর ছেঁচে দিয়েছে।

ফটিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, তাই বলাই উচিত। কিন্তু তুমি তা বলবে না।

কেষ্ট আয়নায় মুখ দেখছিল, আয়না খানা রেখে হঠাৎ তার একখানা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে, কেমন করে জানলি?

মুখ নিচু করে অস্ফুটস্বরে ফটিক বললে, আমি জানি।

—কি জানিস?

—তুমি আমায় ভালোবাসো।

—আর তুই?

কম্পিতস্বরে ফটিক উত্তর দিল, আমিও বাসি।

খুশিভরা হাসি মুখে কেষ্ট বললে, তবে তখন মিছে কথা বলল্লি কেন?

—তুমি মাঝে মাঝে আমায় বিশ্রী রাগিয়ে দাও।

—আর দোব না। আমি বুঝতে পেরেছি।

কেষ্টর মুখের পানে চেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে ফটিক বললে, কিন্তু এ আমি কি করলুম বলোতো। মুখখানার কি দশা হলো।

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, বেশ তো হলো। মুখের ওপর তোর ভালোবাসার চিহ্ন আঁকা রইলো। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানিস?

—কী?

—গালে একটা চুমু খাবার আগেই গালটা দিলি থেঁতো করে?

—ধেৎ। তুমি ভারি অসভ্য।

ফটিকের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

গাজন আসন্ন। মাঝে দশ বারো দিন বাকি। গাঁ সরগরম হয়ে উঠেছে। চাষি মহলে তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে গস্ত করবার। লাইনবন্দি গাড়ি চলেছে ধান নিয়ে বর্ধমানে। আড়তে ধান বেচে মাল গস্ত করবে। কিনবে সংসারের তেল নুন। ডাল কলাই। মসলা-পাতি। কাপড় গামছা। চাষিরা তো কোমরে টাকার থলি বেঁধে বাজার করতে যায় না। তারা যায় ধানের বস্তা নিয়ে। এই চোৎ মাসে তারা সংসারের যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী কিনে ঘরে মজুত করে। সামনে বর্ষা। বর্ষায় পথ অচল হয়ে যায়। কাঁচা মেটে রাস্তা। তবু পলাশীর আধেক রাস্তা আধ-পাকা হয়েছে বর্ধমানের উমাচরণ উকিল আর আদালতের পেশকার হরি বিশ্বাস মশায়ের খোঁচা খুঁচিতে। কিন্তু দুঃখের বরষার দুখ্য তবু ঘোচেনি। কোলগাঁয়ের হাটতলা পর্যন্ত পাকা সড়ক। সচল না হলেও অচল নয়। তারপর গাঁ পর্যন্ত হাপুসুটি কান্না। মা রক্ষে কারো। গাড়ির চাকা ডুবে গেল। গরুর পা পুঁতে গেল। কাদা নয় তো কাদার ঢোলসমুদ্র।

গরু খুলে, গাড়ির চাকা খুলে মাথায় বয়ে গাড়ি পার করতে হয়। গরুর পেটে বাঁশের চাড়া দিয়ে গরু উদ্ধার করতে হয়। চোখে না দেখলে সে দৃশ্য কল্পনা করা দুঃসাধ্য। বর্ণনা করা অসাধ্য।

কাজেই বর্ষার আগেই গাঁয়ের লোক এমন কি দোকানীরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটে বর্ধমানে মাল খরিদ করতে। তা ছাড়া গাঁয়ে উৎসব। উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে আত্মীয় কুটুমের ভিড় জমে। তাদের আতিথ্যের জন্যও ঘরে মাল মশলার দরকার। বাঙলার ও বাঙালীর আতিথ্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রচলিত। পলাশীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চলতি পথে অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে তৃষ্ণার জল চাইলে তারা একঘটি ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে দেবে দু-টুকরো পাটালি অথবা খানিকটা কাঁচা গুড়। শুধু জল কখনো দেবে না। শ্রদ্ধার দান অমৃত মনে হয়।

ফটিক ও বর্ধমানে যাবে কাল ভোরে হাট বাজার করতে। কৃষান বাহাল ধাওয়া যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে। সে গাড়ির চাকায় তেল শোন দিয়েছে। চাকার হাল পরীক্ষা করে নিয়েছে। বলদের গা ধুইয়ে দিয়েছে। ফটিকের সঙ্গে মরাই থেকে ধান বের করে ধানের বস্তা সেলাই করেছে। তারপর সন্ধ্যায় গরুদুটোকে ভরা ভরতি খোল ভিজোনো জাব দিয়ে বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় কেষ্টর সঙ্গে দেখা করে বলে গেল, ফটিকদাকে ভোরে উঠতে বলবেন। ভোর থাকতে বেরোনই ভাল, নইলে বেলা বাড়লে রোদে কষ্ট হবে। খোলা গাড়ি। আর যা যা কিনতে হবে সব ভালো করে গুছিয়ে বলে দ্যাবেন আপুনি। যে ভোলা মানুষ।

কেষ্ট হাসলে। বললে, তোমাদের দড়িদড়া, তামাক গুড়, তেল শোন, খোল ভুষি তুমি সব বেবস্থা করে নিয়ো। আর আমাদের সংসারের জিনিষ আমি সব ফর্দ করে দিয়েছি। কত্তাও বলে দেবে।

কেষ্ট এক সরা মুড়ি মুড়কি তার গামছার আঁচলে ঢেলে দিতে দিতে বললে, আর ঐ হেরিকেনের কাঁচ আর পলতে বেশী করে নিয়ো। কাঁচগুলো সব ভেঙ্গেছে। ধোঁয়ায় চোখে দেখা যায় না।

বাহাল মুখখানা কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে,একটা কথা বলছিনু আপনাকে—

কেষ্ট মুখ তুলে তাকালো তারপানে।

বাহাল বললে, আপনাকে তো বলিনি কখনো, তবে না বললে নয়, তাই বলতে হচ্ছে—

—বল না।

মাথা নিচু করে সে বললে, ফটিকদাকে যদি বলে দেন আমাকে কিছু টাকা দিতে। গাজনঘর। বউয়ের জন্যে একখানা শাড়ি আর ছেলেমেয়ের জন্যে দুটো জামাজুমি কিনবো। আগাম তো সব নিয়ে নিইছি। কর্ত্তাকে চাইতে গেলে মারমুখি হবে।

হাসতে হাসতে কেষ্ট বললে, তা ফটিকের কাছে চাইলি না কেন?

—উ বলবে, কর্তাকে না বললে আমি টাকা পাবো কম্‌নে?

—তা সত্যি। ও টাকা পাবে কোথা যে কর্তাকে লুকিয়ে দেবে?

—আপুনি বলে দ্যান্ মা। উ ঠিক দেবে। আপনার কথা কখখনো ঠেলবেনা। আপনারে উ ভারি ভক্তি করে।

কেষ্ট মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপল।

—ক' টাকা?

—অন্ততঃ দশবারো টাকার কম কি হবে?

কেষ্ট কি ভাবলে। তারপর মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা যা। বলবো।

বাহাল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেষ্ট দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে অন্ধকারের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অদৃশ্য অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ঝিঁঝি যেন বাহালের গলায় প্রতিধ্বনি। জোট পাকিয়ে বলছে, উ আপনার কথা কথখনো ঠেলবে না। আপনারে ভারি ভক্তি করে।

পাঁচিলের বাইরে তেঁতুল গাছের মাথায় অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে, তার হৃদয়ের গোপন অভিলাষের মতো। জোনাকির মতই ভীরু সে অভিলাষ। থাকে থাকে নিভে যায়। তার চোখে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে। ঝিরঝিরে বাতাস। আকাশ পরিষ্কার। তার পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়। মধুর মনে হয় সংসারের এই পরিবেশটি।

সত্যিই ফটিকের ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি মেশানো। কিন্তু তারও একটু কৃতজ্ঞতা থাকা দরকার। প্রতিদান তাকে কিছু দিতে হয়। কিন্তু ফটিক ভারি ছেলেমানুষ। কোন কিছু বোঝে না কেন ?……

যুদ্ধ বেধেছে। বিপুল বিরাট যুদ্ধ। ঘন ঘন তরপানি। হুঙ্কার আর হুমকি। একদিকে ফটিক। অন্যদিকে তার ঠাকুরদা ভক্তহরি।

রান্নাঘরে রাঁধতে রাঁধতে কেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে জ্বলন্ত উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ভক্তর সঙ্গে ফটিকের তুমুল বাকযুদ্ধ হচ্ছে। ভক্ত বাদশাই গলায় হুমকি দিচ্ছে। ফটিক গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছে। যেন বাঘে ষাঁড় ধরেছে।

ফটিক আস্ফালন করছে, বাড়িঘর জমিজমা ধানচাল আমার বখরা করে দাও। আমি তোমার হাততোলায় আর থাকতে পারবো না।

ভক্ত হুমকি দিচ্ছে, না থাকিস বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে। কিসের বখরা? বাপের সম্পত্তি কিনা বখরা নিতে এসেছে? কিচ্ছু দোবো না। এক ছটাক জমি দোব না।

ফটিক বেশী রাগলে একটু তোতলা হয়ে যায়। মুখ থেকে কথাগুলো এড়িয়ে যায়। সে রাগে তো-তো করতে করতে বলল, আমার বাপের সম্পত্তি কেন তোমার বাপের একার সম্পত্তি। দোবো না? মগের মুলুক কিনা দেবে না? গলায় আঙুল দিয়ে বের করে নোব। গাঁয়ে ভদ্দরনোক নেই? সালিশী পঞ্চায়েৎ নেই? জমিদার নেই?

কেষ্ট ত্রাস্তে উঠে এলো দাওয়ার উপর। পাছে ফটিক আবার ভক্তর কপাল ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দেয়। যোদ্ধারা দুজনেই একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল। আগুনে জল পড়ল শিখণ্ডীর আবির্ভাবে।

—কিসের ঝগড়া গো তোমাদের?

ফটিক মাথা নিচু করল। সে তখনো কাঁপছে।

ভক্ত ফোকলা দাঁতে একমুখ হেসে বললে, শালার ষাঁড়ের চেঁচানি শুনে বুঝি রান্না করতে করতে ছুটে এলে? ছোটলোক হারামজাদার কাণ্ড দেখ দিকি। শালা সাপের পাঁচ পা দেখেছে। ধানের মরাই দেখে গরমে গেছে।

ফটিক মাথা ঝাড়া দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, কেষ্ট তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিল।

ভক্ত বললে, চাষার ছেলে বাবু সাজবে? ওঁর জামা, গেঞ্জি,

জুতো কেনবার জন্তে পঁচিশ টাকা চাই। পঁচিশ টাকা পাঁচ মণ ধানের দাম। নবাবী দেখো একবার।

ফটিক আরেকবার মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল। কেষ্ট চোখের ধুলোপড়া দিয়ে অস্ফুট শব্দ করল, আঃ!

ফটিক ফণা গুটিয়ে নিল।

কেষ্ট মধুর ভঙ্গিতে কটাক্ষ হেনে ভক্তকে বললে, তা গাজনঘরে একটা নতুন জামাকাপড় পরবে না? আহা ছেলে মানুষ তো? ওর তো এখন শখ করবার বয়েস।

ফটিক ঘাড় দুলিয়ে বললে, না। আমার কিছু চাই না। আমি ওর ধান কাটবার জন মুনিষ নই। ওর—

কেষ্ট বাধা দিল, ছিঃ! গুরুজনের সঙ্গে কি অমন করে কথা বলতে হয়?

ভক্তর অগোচরে চোখে একটা ঝলকানি দিয়ে মুখ টিপে হাসলো। বললে, মানীর মান রেখে কথা বলতে হয় তো—

ফটিক মনে মনে হাসলো।

ভক্ত হাসতে হাসতে বললে, শালা চাষার ছেলের কি ও সব গেয়ান বুদ্ধি আছে? যে ডালে দাঁড়িয়ে আছিস সেই ডাল তুই কাটছিস?

ফটিকের পানে চেয়ে সে বললে, শুনছিস চাষা, কী মিষ্টি কথা বলে আমার রাধারাণী। শিক্ষে করিস ওর পায়ের তলায় বসে। আমার প্রেমময়ী, রাই কিশোরী।

কেষ্টর কটাক্ষ-জর্জরিত ভক্ত বুভুক্ষুর মত তার মোহিনী ভঙ্গির পানে ঘন ঘন চাইতে লাগল আর 'জয়রাধে' বলে বুকের নিচের ঢেউ কাটাতে লাগল।

কেষ্ট এইবার শেষ মোক্ষম শর নিক্ষেপ করলো। মধুর হাসিতে

ঠোঁট ভিজিয়ে আর কণ্ঠে খুব খানিকটা মধু ঢেলে বললে, তা হেঁগা, তুমি হয়তো আবার চটে যাবে। কিন্তু আমিই বা কি পরে গাজন দেখবো? একখানা তো ভাল শাড়ি নেই। একটা জামা নেই। কতো দেশ বিদেশের লোকজন আসবে।

—বটে তো। তা বটে তো। এ-কথা তো মনে হয়নি। তোমার ওপর আমি রাগ করবো? অন্যায় না করলে কি আমি কারুর ওপর রাগ করি নাই! এ একটা লেজ্জ কথা। বলতে পারো বইকি। আমি উদাসী বলে তো তোমাকেও এই বয়েসে বোষ্টুমী সাজিয়ে রাখবো না।

ফটিক ভেতরে ফুলছিল। কেষ্ট তাকে চোখের ইঙ্গিতে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করে রাখছিল।

ভক্ত বললে, তা ফটকে কিনে এনে দেবে তোমার জন্যে একখানা ডুরে শাড়ি আর একটা সেমিজ।

ফটিক নিঃশব্দে মাথা নত করল।

কেষ্ট এইবার সকরুণ ভঙ্গিতে ফটিকের পানে চেয়ে ভক্তকে বললে, তা হ্যাঁগা। ওযে মুখ শুকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর একটা বেবস্থা করো।

ভক্ত তার পানে চেয়ে মোটা ঘাড় নেড়ে বললে, আমি দশটাকার বেশী দোব না।

—আমার চাই না।

আগুনে গলায় ফটিক বলে উঠলো।

কেষ্ট মধ্যস্থ হয়ে বললে, আচ্ছা বাপু আর পাঁচটা টাকা দাও। যাকগে মরুকগে কী আর হবে। একবার বই তো নয়। বচ্ছরের দিন—

—তুমি যখন বলছো, তখন—দিচ্ছি। কিন্তু বেশী আস্কারা দিও না ওটাকে।

কেষ্ট ফটিকের পানে চেয়ে বললে, হয়েছে তো যাও। তুমি একবার আমার কাছে এসো ফটিক। সমসারের যা যা আনতে হবে সব বুঝিয়ে দেব। উনোনটা হয়তো আবার নিবে গেল।

বলতে বলতে সে দ্রুতপায়ে দাওয়া থেকে নেমে গেল। ক্ষুধিত দৃষ্টিতে ভক্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তার পেছনে চেয়ে রইলো।

রাত্রে ফটিককে খেতে দিয়ে কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, কতো টাকা হলে তোর হবে তাই বল। অমন মুখ ভার করে থাকিসনি। কাল সারাদিন তোর মুখ দেখতে পাবো না। কী যে করিস!

ফটিক তার পানে মুখতুলে মৃদু হাসল। ভুরু কুঁচকে বললে, বলে কি হবে? তুমি দেবে নাকি?

কেষ্ট বললে, কতো টাকা পেলে তুই খুশি হবি তাই বল। কতো টাকা হলে আমাদের দুজনের সব কেনাকাটি হবে হিসেব করে বল। টাকার জন্যে ভাবিসনি।

—তুমি টাকা পাবে কোথা?

কেষ্ট ধমকের সুরে বললে, আরে গেল। কতো লাগবে তাই হিসেব করে বলনা।

মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করে ফটিক বললে, তা সবশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকা হলে একরকম হয়। পঁচিশ টাকা দিয়েছে তো বুড়ো?

—না তিরিশ টাকা দিয়েছে।

—তা হলে এখনো কুড়ি টাকা।

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে একটা পিতলের হাঁড়ির ভেতর থেকে পাকানো একতাল দশটাকার নোট বের করে ফটিকের হাতে দিল। বললে, গুনে দেখতো কতো আছে।

ফটিক বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে বললে, পেলে কোথা এতো টাকা?

—গোন্‌না আগে।

—এগারো খানা। একশো দশটাকা।

কেষ্ট বললে, একখানা আমায় দে। গাজনের মেলায় খরচ করবো। আর তুই একশো টাকা নিয়ে যা। বুঝে খরচ করিস। বাহাল কাকাকে দশ পনেরো টাকা দিস। এক বোতল খোসবাই তেল আর দুখানা গায়ে মাখা সাবান কিনিস আমার। আর মাথার কাঁটা ফিতে—

ফটিক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো, সব কিনবো। কিন্তু এতো টাকা তুমি চামারের কাছ থেকে বাগালে কেমন করে?

—ইস্‌! বাগানো অমনি সহজ কিনা? ঐ তিরিশ টাকা দিতেই পাঁজর খসে গেছে ওর।

—তবে?

—বাকিটা চুরি করেছি।

ফটিক চমকে গেল। বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, সে কি? কেমন করে? কোত্থেকে?

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, সে বলবো'খন বর্ধমান থেকে ফিরলে। তোকে দেখিয়ে দেব ওর গুপ্তধনের ভাণ্ডার। আজ আমায় বিশ্বাস করে দেখিয়েছে।

কেষ্ট ফটিকের খুব কাছে সরে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, বুড়ো ডাকাতি করে নাকি রে?

—কেন? অনেক টাকা?

—আমাদের কাছে অনেক বই কি!

—কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করলে? যদি ধরা পড়? যদি জানতে পারে?

কেষ্ট ফটিকের গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, কী আর

হবে? তোর হাসি মুখ দেখবার জন্যে আমি না হয় একটু লাথি ঝাঁটা সইব। একটু কাঁদবো।

—ধ্যেৎ! তুমি কি পাগল নাকি?

—পাগল তো তুই আমায় করেছিস।

মধুর হাসি হেসে কেষ্ট বললে, টাকাগুলো ভালো করে পেট কাপড়ে বেঁধে নিস।

॥ পাঁচ ॥

রাতের ঘোর কেটে গেছে। আকাশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। পুব আকাশে লালের ছোপ ধরেছে। গাছের মাথায় পাখির কল কাকলি শোনা যাচ্ছে। ভোরের হালকা বাতাস বইছে। ঘুমন্ত গ্রামের ভিতর থেকে ফটিকের ধান বোঝাই গাড়ি বেরিয়ে এসে মাঠে উঠলো। এখন সরান দিয়ে ঘুরে যাবার দরকার নেই। খালি মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে। আল্ কেটে মাঠের উপর দিয়ে গাড়ি যাতায়াতের পথ হয়ে গেছে। পালের পুকুরের কোল দিয়ে বড় বাগানকে ডাইনে ফেলে মাঠের পথ ধরে কোলগাঁ পার হলেই একেবারে সোনপুরের পাকা রাস্তায় ওঠা যায়। অনেকখানি পথ কম হয়।

গাঁয়ের শেষ সীমানায় গাড়ি এসে পৌছলে ফটিক একবার পেছন ফিরে গ্রামের পানে তাকালো। ঝাপসা হয়ে এসেছে পালে পুকুরের কোলের আমবাগান। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শুধু পাড়ের উপর এক জোড়া তালগাছ। সব তাল গাছকে ছাড়িয়ে এই গাছদুটো মাথা উঁচু করে উঠেছে। দূর থেকে যখন আর সব ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে যায় তখনো দিগন্তের শ্যামোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই গাছ দুটো এক জোড়া গম্বুজের মত স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা দেবে। দিগন্তের কোলে কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার মতো। আর দেখা যাচ্ছে আমবাগানের মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পলাশের রাঙা মুণ্ড।

ফটিক চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে। অন্যদিন এমন সময় কেষ্ট উঠোনে ঝাঁট দেয়। গোবর গোলা দিয়ে ঘর দাওয়া নিকোয়।

ফটিক ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় বসে। কেষ্ট তার পানে চেয়ে মৃদু হাসে। সকালের প্রথম রোদের মতো মধুর সে হাসি। কাজ করে আর আপন মনে হাসে। অফুরন্ত তার হাসি। ভক্ত কাছে থাকলে সে তেরছা চোখে গোপনে তার পানে তাকায়। দুজনে চোখো-চোখি হলে চোখের কোণে ঝিলকিয়ে ওঠে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ শিখা। তারি মাঝে হয়ে যায় তাদের অনেক কথা।

অনেক হাসি দেখেছে সে। অমন মধুর প্রাণ মাতানো হাসি সে আর কখনো দেখেনি। দেখেছে অনেক চোখ। অমন তৃষ্ণাভরা মদির চোখ কখনো দেখেনি সে। যাদু আর মায়াভরা দুটি চোখ। ফটিকের মনে ঝড়ের বাঁশী বাজায়। কী দুর্জয় শক্তি ওর দুর্বার যৌবনের। ফটিকের মনে হয় ও সামান্য নয়। ও সাধারণ নয়। ও অনেক বোঝে। অনেক জানে। চাষার ঘরে ওকে মানায় না। ওর কপাল খারাপ তাই গরীবের ঘরে জন্মেছে। আর ভক্তর আশ্রয় নিতে হয়েছে। ভক্ত কি ওর যুগ্যি নাকি। যদি বা ওর কোন আশা ছিল ভক্তই ওর সব আশা আকাঙ্ক্ষায় ছাই চাপা দিয়েছে। কি করে যে ওর আপনজন ওকে ভক্তর হাতে তুলে দিল, তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কেষ্ট কিন্তু নিস্পরোয়া। তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে সে হা হুতাশ করে না। নিজেকে সে অভাগিনী ভাবে না। জীবনকে সে মেনে নিয়েছে। হাসি মুখে। ফটিকের মনে হয় বিধাতা ওর মুখে হাসি মাখিয়ে ওকে গড়েছে। হাসিটুকু মুখে লেগেই থাকে।

কে জানে এখন সে কি করছে? মনটা আজ তার ভাল থাকবে না। সারাটা দিন তাকে দেখতে পাবে না। তার ফেরবার আশায় সন্ধ্যার পর থেকে ঘরবার করবে। ফটিকের হাসি পায়।

ভালোবাসার চেহারাটা কল্পনা করে। তার অদ্ভুত মনে হয়। চোখে ভালোলাগার নামই কি ভালবাসা? কেনই বা তাকে এতো ভাল লাগে? আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতো মেয়ে। তাদের তো এমন ভাল লাগে না। এ যেন এক সৃষ্টি ছাড়া ভালোলাগা। দূর থেকে, আড়াল থেকে দেখলেও মনটা ভরে যায়। না দেখতে পেলে সব শূন্য মনে হয়। এর কারণ কি? তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই অথচ সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ মনে হয়। দেহের একটা প্রধান অঙ্গ মনে হয় তাকে।

ধিকিয়ে ধিকিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে। ফটিকের বুকের তলায় কেষ্ট দাপাদাপি করে। কেষ্টর ভাবনাকে সে মন থেকে সরাতে পারে না।

আর ভাবতে ও তো তাকে ভালো লাগে। বেশ লাগে।

কেষ্ট যেন তাকে আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে ধরে আছে। তার সর্বাঙ্গে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেষ্টর হাতের খারে কাচা কাপড় জামা গেঞ্জি তার গায়ে। কেষ্টর দেওয়া জলখাবার। পেট কাপড়ে বাঁধা কেষ্টর দেওয়া টাকা।

কেষ্টর জন্যে একখানা ভালো শাড়ি কিনবে। একটা জামা কিনবে। যেমন বেনে বাড়ির বউরা পরে। ভালো জামা কাপড় পরে সাজলে তাকে কী কম সুন্দর মানাবে। ফটিকের বুকের নিচেটা আনন্দের ব্যথায় টন টন করে। তার ভাগ্য ভালো। কেষ্টর মত সুন্দরী মেয়ের তাকে চোখে ধরেছে। তাকে ভালোবেসেছে।

সোনপুরের তেঁতুল তলা।

গাঁয়ের ঘুম ভেঙেছে। কলসী কাঁকে মেয়েরা পুকুর ঘাটে জড়ো হচ্ছে। পথে লোকজন বেরিয়েছে। মুখে দাঁতন নিয়ে

ঝোপঝাড়ের দিকে চলেছে। শৌচ করবার আড়াল খুঁজতে। পায়খানার বালাই তো নেই এখানে। মাঠ, ময়দান আর পুকুরপাড় এখানকার শৌচাগার।

বাহাল বললে, গোঁসাইজু যাচ্ছেন।

ফটিক সামনের পানে চেয়ে ডাক দিল, দাদাগোঁসাই! ও দাদা গোঁসাই।

আরে গেল। শুনতে পেলে না নাকি?

—ও বিষ্টুদা।

বিষ্টু গোঁসাই পিছু ফিরে তাকাল।

গাড়ি এগিয়ে গেল। ফটিক জিজ্ঞেস করলে, কিগো ঠাকুর বর্ধমান যাবে তো?

বিষ্ট জিজ্ঞেস করলে, তুই? ধান বেচতে?

—এজ্ঞে। উঠে এসো গাড়িতে। তাড়া নেই তো?

বিষ্ট গোঁসাই। বকুলতলার গোঁসাই বাড়ির ছেলে। বয়সে তরুণ। ফর্শা ধপধপে গায়ের রঙ। লম্বা পাতলা চেহারা। নিত্যানন্দের বংশধর বলে ওরা পরিচয় দেয়। বিষ্ট সুকণ্ঠ। ভাল গাইতে পারে।

ধানের বস্তার ওপর একখানা চট বিছিয়ে গোঁসাইজীর বসবার জায়গা করে দিয়ে ফটিক তাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল।

বিষ্ট বললে, জয় হোক। নে, তামাক সাজ।

দুজনে প্রায় একবয়েসী। সম পর্যায়ের নয় বলেই যা, নইলে বন্ধুর পর্যায়ে পড়ে। তবে অন্তরে দুজনে বন্ধু।

গাড়ি চললো ভিটের ভেতর দিয়ে। বিষ্ট হাতে কলকে নিয়ে টান দিতে দিতে বললে, তো বেটার জয় অনিবার্য। মাইরি, তোর কপালটা চকচক করছে ফটকে।

ফটিক মুখটিপে হাসতে হাসতে বললে, তোমাদের আশীর্বাদে।

—আমাদের আশীর্ব্বাদেই তরে যাচ্ছিস। যাবিও।

গোঁসাই মুখ আলগা রসিক মানুষ। বাহালের সামনে আবার কি রসিকতা করে বসবে, কে জানে। তাই সে কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলে, জয়দেব পালায় তুমি কি পাঠ করবে দাদা গোঁসাই ?

গোঁসাই বললে, আমি আর কি করে পাঠ করবো ? কলকাতায় রিহার্সেল, এখানে প্লে। তবে সাজাহানে একটা ছোট পাঠ করবো।

দুজনে থিয়েটারের কথায় মেতে গেল।

বিষ্ট বললে, এবারে কিন্তু সত্যিকার ভাল থিয়েটার হবে রে ফটকে। আশপাশের কোন দলকে আর পলাশীর সরস্বতী থিয়েটারের কাছে দাঁত ফোটাতে হবে না। এরি মধ্যে চারপাশের গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। মানকড় থেকে পর্যন্ত গোঁসাইরা এবং বহুলোক আসবে জয়দেব দেখতে। জয়দেব কি এখনো অ্যামেচার পার্টি কেউ করেছে নাকি ? কতো গান ? আমাদের এখানে গান বাজনার চর্চা আছে তাই সাহস করেছে।

বিষ্ট বলে। ফটিক মনোযোগ দিয়ে শোনে। নিজের গ্রামের গৌরবে তার বুকখানা দশহাত হয়ে ওঠে। সে অবাক হয়ে ভাবে দেশের এই এঁটেল মাটিতে কতো গুনী লোকেরই না সৃষ্টি হয়েছে।

কুং কুং ! কুং কুং !

বিষ্ট বলে ওঠে, আরে, পানি মিস্ত্রী রে !

পানি মিস্ত্র সাইকেলে বর্ধমান যাচ্ছে। যে কদিন গাঁয়ে

থাকে সে, সে কদিন এই করে বেড়ায়। সাইকেল নিয়ে বর্ধমান আর পলাশী। পলাশী আর বর্ধমান। জীবন মিশ্রর ছেলে। জীবন মিশ্র কলকাতায় প্রসিদ্ধ ধনী হরেন শীলের ম্যানেজার। পুরোহিত এবং সর্বেসর্বা। মুখুজ্জেদের আগে উনিই গ্রামের জমিদার ছিলেন। পান্নু মিশ্র সৌখিন ছেলে। ভালো দামি সিগ্রেট খায়। সিগ্রেট ফুরোলেই বর্ধমান যায় সিগ্রেট কিনতে। সঙ্গে আনলো কিছু সীতাভোগ মিহিদানা।

বাড়ির সব থাকে কলকাতায়। পান্নুর কিন্তু পাল পার্বন বাদ যাবার জো নেই। সে ঠিক পলাশীতে এসে হাজির হবে। গাঁয়ের ওপর তার একটা বিশেষ মমতা আছে। বৈঠকখানা খুলে ইয়ার বন্ধু নিয়ে আসর জমাবে। হৈ হৈ করবে।

বড় মজার লোক এই পান্নু। লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেও যেমন, লোকের উপকার করতেও তেমনি। গাঁয়ের ভালো মন্দ সব কাজেই তার সমান আগ্রহ।

সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। রঙ ফর্সা। সর্বাঙ্গে আভিজাত্য ফেটে পড়ছে।

বিষ্টু গোঁসাই পান্নুর 'প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলি'। দুজনে যতো ভাব ততো ঝগড়া। একেবারে গলায় গলায়।

পান্নু সাইকেল থেকে নেমে গাড়ির কাছে দাঁড়াল। বললে, থিয়েটারের পাঞ্চলাইট আর পাল ঠিক করতে যাচ্ছি।

বিষ্টু বললে, একটা সিগ্রেট দে।

পান্নু বললে, তা দিচ্ছি। কিন্তু তুই ওর ধানের বস্তায় বসে কি করছিস?

বিষ্টু তাল সামলাতে পারলে না, সামনের উঁচু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললে, ফটিকের সঙ্গে কেষ্ট-কথা কইছি।

ফটিকের রোদে-তাতা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। সে চোখের ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করলে, বাহাল কৃষাণ রয়েছে সঙ্গে।

বিষ্টু বললে, জানিস পানি ও বেটার মনে পাপ ঢুকেছে।

পান্নু বললে, পাপ না খেঁচু। ফটকেটা মেনিমুখো তাই—আমরা হলে—

ফটিক কথাটা চাপা দিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে কিন্তু পান্নুদা আমার বর্ধমানে জরুরী কাজ আছে। আমার কিছু কেনাকাটা করে দিতে হবে।

পান্নু তার মুখপানে চেয়ে হাসল। বললে, আচ্ছা। কোন আড়তে গাড়ি রাখবি?

—চারু রায়ের কাঠ গোলায়।

—আচ্ছা দেখা হবে।

পান্নু বললে, বিষ্টে তুই নেমে আয়না। আমার পেছনে বসে যাবি।

—আমি পারবো না।

—গোঁসাই-এর ঘরে একটা চাষা জন্মেছিস।

পান্নু সাইকেলে উঠলো। বললে, তোরা বাজেপেতাবপুর পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমি বর্ধমান ঘুরে আসবো।

ফটিক বললে, আমাদের দেরি হবে। আমি দাওয়ান দিঘিতে ধান বিক্রি করবো।

—কেন, বাজেপেতাবপুরে?

—না। ঠাকুবাবা বলে দাওয়ান দিঘিতে ভাল দর দেয়।

পান্নু বললে, দেবে না কেন। ওজনে মারে।

ফটিক হাসলো।

বাহাল বললে, ঠাকুর ঠিক বলেছে।

বিষ্টু বললে, বর্ধমানে খাওয়াবি তো পানি ?

পান্নু বললে, ইষ্টিশানে কেল্‌নারে যদি ভাতমাংস খাস খাইয়ি খাওয়াবো।

সকলে হেসে উঠলো।

ঝিকিমিকি বেলা। যাকে বলে গোধূলী। নিভে যায়নি দিনের আলো। অস্পষ্ট আর ঝাপসা হয়ে এসেছে। নেভবার আগে আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে একবার করুণ চোখে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখছে। আকাশের এ রঙ ক্ষণস্থায়ী। স্বল্পায়ু। স্বপ্নের মত এখুনি মিলিয়ে যাবে। তারপর বোবা অন্ধকারে সব ডুবে যাবে। কেষ্ট একা রান্নাঘরের দাওয়ায় শরীর এলিয়ে দিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আকাশে রঙের খেলা দেখছিল। এলো চুলগুলো ঝাঁকর মাকর। মুখের উপর উড়ছে। কাঁধের উপর লুটোচ্ছে। চুল বাঁধেনি। স্থির হয়ে বসে কি ভাবছে সেই জানে। তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হয় ওর মন চলে গেছে কোন সুদূরের দিকে। রক্তাভ আকাশের কোলে ওর চেতনা যেন সূর্যের শেষ রক্তরশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সে স্বপ্নআঁকা চোখে উর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে। একটা গভীর বিষাদের সঙ্গে যেন কঠোর সঙ্কল্প মিশে আছে তার মুখে। সে যেন নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার মন্ত্রপাঠ করছে।

—কই লো গেঁদা ফুল ?

বোষ্টমদের চণ্ডী এসে দাওয়ার নিচে থমকে দাঁড়াল।

কেষ্ট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাসল মৃদু রেখায়।

চণ্ডী তার মুহ্যমান স্তিমিত ভঙ্গির পানে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো খুঁটি ধরে।

—আয়, উঠে বোস।

ডাকলো কেষ্ট।

—কিন্তু তোর ব্যাপার কী? ভরসন্ধে বেলা এমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছিস কেন লা? হলো কি?

কেষ্ট গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললে, হবে আবার কি? একা একা করি কি?

—ওঃ! স্বপ্ন দেখছিলি? বিরহ? শ্যাম গেছে মথুরায়?

—দুর! শ্যাম ছেড়ে গেলে বাঁচবো কি নিয়ে?

—তবে এমন দশা কেন? শোনের দড়ির মত চুলগুলো উড়ছে। অমন রসালো টসটসে মুখ শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে। চোখদুটো ছলছল করছে। কী হয়েছে গেঁদাফুল সত্যি বল। বসে বসে কাঁদছিলি নাকি?

চণ্ডী তার পাশে বসে একখানা হাত চেপে ধরলো।

কেষ্ট বললে, উঃ! তোর হাত এমন গরম কেন লা?

চণ্ডী একগাল হেসে বললে, তা জানিসনি বুঝি, আমার যে বাত্তিকের ধাত।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ রে। জানিস নি বুঝি? মনের মতন বর না হলেই মাগিদের বাত্তিক বাড়ে।

কেষ্ট হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, তা হলে আমার?

—তোর মন ভরা বলে হয়তো এখনো দেহকে ছুঁতে পারেনি। আমার যে দুই খালি। পড়ো ডাঙ্গার মতো খাঁ খাঁ করছে। কোথাও একটু ছায়া নেই। ভিজে নেই।

—তবু এতো রস?

—এ গোড়ার রস। মাটির নিচের রস। বোষ্টমের মেয়ে। জন্মেছিলুম যে রসের ভাবে। মায়ের রসকলি আর বাপের এক—

তারার সুরে বোষ্টম পদাবলী। তার রস কি এতো শীগ্রি শুকিয়ে যায়?

কেষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

চণ্ডী তার গায়ে একটা ঠুসি মেরে বললে, আমার জন্যে দীর্ঘ-শ্বাসগুলো বাজে খরচ না করে নিজের জন্যে তুলে রাখ। অসময়ে কাজে লাগবে।

—অসময় তো বারো মাস। সময় কবে আসবে গেঁদাফুল?

হাসলো কেষ্ট তার মুখের পানে চেয়ে।

চণ্ডী বললে, আসবে রে আসবে। এসা দিন নেহি রহেগা।

—তবে কেসা দিন আয়েগা?

চণ্ডী বললে, বলছি। তুই চুল বাঁধাটা নিয়ে বোস ঝিকিনি। তোর চুল বাঁধতে বাঁধতে যেসা দিন আয়েগা তার বর্ণিমা দিই।

কেষ্ট বললে, তবে বড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠে চল।

এক চালায় পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে লম্বা দাওয়া। এই দুখানা শোবার ঘর। একখানা ভক্তর। একখানা কটিকের। এরই নাম বড় ঘর। সামনে উঠোন। উঠোনে কটা ফুলের গাছ। করবী টগর, শিউলি। উঠোনের ও-পারে রান্নাঘর। বড় ঘর থেকে সেটা নজরে পড়ে না। বলা বাহুল্য মেটে ঘর। মাটির দেয়াল খড়ের চাল। বাড়ির চারিপাশ মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বর্ষার হাত থেকে রক্ষা কররার জন্যে দেয়ালের মাথায় ও খড়ের ছাউনি। খড়ের অভাবে অনেকে কেয়া পাতা দিয়েও দেয়ালের মাথা ঢাকে।

বড় ঘরের দাওয়ায় চেটাই বিছিয়ে বসে চণ্ডী কেষ্টর বেণী বেঁধে দেয় আর গুন্ গুন্ করে সুর ভাঁজে।

কেষ্ট বলে, কি সো একটু পষ্ট করে বল। আমি একটু শুনি। গলা একটু ছাড় না, কে-বা এখানে আছে?

চণ্ডী বলে, থাকলেই বা। আমি কি কারুকে ডরাই নাকি? আমারি ব্রজবুলির ভয়ে গাঁয়ের লোকে তটস্থ। দেখিস নি সকলে আমায় কি ভাবে এড়িয়ে চলে।

খিল খিল করে হাসলো কেষ্ট : ব্রজবুলিই বটে।

চণ্ডী তার পিঠে ঠেলা দিয়ে হাসলে। বললে, চণ্ডীকে কেউ বুঝলে না রে গেঁদাফুল। পিরীত না করেও চণ্ডী বোষ্টমী পিরীতের মর্ম বোঝে।

—করিস নে কেন?

—মনের মানুষ জোটে না বলে। পিরীত করবার মতো পুরুষ কোথা? রসিক সাজলেই তো রসিক হয় না।

চণ্ডী সুর করে গায় :

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহও রসিক নয়।
ভাবিয়া গনিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥"

—সত্যি?

—তা নয়তো কি? এ সব মহাজনের কথা। এখানকার পুরুষ-গুলো রসিকতা করতে আসে পকেটে টাকা বাজিয়ে। খ্যাংরা মারো মুয়ে। তোর টাকার কে ধার ধারে রে। বর্ধমানের মহাজন টুলিতে যা।

কেষ্ট হাসতে হাসতে বলে, এতোও তুই জানিস গেঁদাফুল।

—জানতে আর কিছু বাকি নেই ভাই। শুধু ছলনা। ছলনার পৃথিবীতে মেয়ে পুরুষে শুধু ছলনা করেই জোটবেঁধে আছে। সত্যিকার ভালবাসা কোথা? সত্যিকার পিরীতি কোথায়? আর মজা কি জানস? তুই যার সঙ্গে পিরীত করতে চাইবি সে তোর

দিকে মুখ তুলে তাকাবে না। আর তোর জন্যে যে মাথা কুটবে, তাকে তোর মনে ধরবে না। কি আশ্চয্যি বলতো?

—তা সত্যি। কেষ্ট শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে আনমনে চণ্ডীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

চণ্ডীর বুঝতে বাকি থাকে না তার মনের কথা। সে হাসতে হাসতে তার চিবুক ধরে বলে, তবে তোর কথা আলাদা। তোর বরাত জোর। ঘরের মাঝেই খুঁজে পেয়েছিস তোর মদনমোহনকে।

কেষ্ট হঠাৎ তার মুখ চেপে ধরে এদিক ওদিক চায়।

চণ্ডী তার হাতের আঙুলে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, কি লো, ভয়? এখনো ভয়? তবে তো পারবিনি। এক গলা জলে দাঁড়িয়ে যদি ডুবতে ভয় করিস তা হলে তো ডুবতে পারবি নি? কিসের ভয়? গঞ্জনার ভয়? কলঙ্কের ভয়? মহাজনের কথাঃ মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়। তা হলে এখনো সময় আছে। ফিরে আয়।

—আমি পারবো না। পারবো না। মরতে হয় মরবো তবু পারবো না।

চণ্ডীর বুকে আছড়ে পরে কেষ্ট অঝোরে কাঁদল। চণ্ডী তাকে বুকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে গাইল:

"পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইবি
জাতি কুল শীল অভিমান॥"

কেষ্ট আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ধরাগলায় বলে, তুঁষের আগুন দিনরাত বুকের মাঝে জ্বলছে গেঁদাফুল। তবু পারছি না কেন?

—কী পারছিস না?

—নিজেকে বিলিয়ে দিতে। নিজেকে সঁপে দিতে।

চণ্ডী নিমেষে তার ব্যথিত মুখের পানে চেয়ে রইলো। কি দেখলো সেই জানে।

কেষ্ট রাঙামুখে কালো চোখের বড়ো বড়ো পাতাগুলো আছড়াতে আছড়াতে বললে, নারে ভয় নয়। লজ্জা নয়। মান অভিমানও নয়।

—তবে ?

কেষ্ট উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল, নিজের ওপর ঘেন্নায় আর ধিক্কারে।

চণ্ডী প্রশ্নভরা ডাগর চোখে তারপানে তাকাল।

কেষ্ট লজ্জালু ভঙ্গিতে মৃদু হেসে চাপা গলায় বললে, তোকে না বলে আর কারেই বা মনের জ্বালা জানাবো। তুই ছাড়া আরতো কেউ জানে না আমার মনের গোপন কথা। একা তোকেই আপনার ভেবে সব বলেছি। যাকে নিয়ে মাথাব্যথা সেও জানে না আমার মনের ইচ্ছে। জানবে কেমন করে ? মুখ ফুটে তো আমাদের কোন কথাবার্তা হয় না।

চণ্ডী কটাক্ষ হেনে বললে, মরন! মুখ ফুটে আবার ও কথা বলতে হয় নাকি ?

মাথা হেঁট করে কেষ্ট মৃদু হাসল। বললে, তবে বলি শোন, কেন আমি এগুতে পাচ্ছি না। চকমকি আছে। লোহাও ঠিক আছে। শুধু সোলা ভিজে বলে আগুন ধরছে না।

চণ্ডী তার কথার খেই ধরতে পারলে না। হাঁ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

কেষ্ট বললে, বুঝতে পারলি না ? মনে আলো জ্বেলে দেহটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নৈবিত্তি করে তবে না ভালোবাসার ঠাকুরের কাছে যাবো। অশুদ্ধ, অপরের এঁটো নৈবিদ্যি নিয়ে আমি

ঠাকুর ঘরে যাই কেমন করে? কি নিয়ে যাবো? কি দোব আমি তাকে?

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কেষ্টর বুকের তলা থেকে।

চণ্ডী শ্রদ্ধাভরা চোখে তার পানে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। তার মাঝে যেন নতুন কিছু দেখেছে এমনি তার মুখের ভাব।

কেষ্ট বললে, সত্যি গেঁদাফুল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ফটিকের মুখপানে তাকাতে পারি না। লজ্জায় মরে যাই। নিজেকে এমনি অশুদ্ধ আর অরুচি মনে হয় কি বলবো। মনে হয় যেন সর্বাঙ্গে পোকা কিলবিল করছে। মুখ খানা পুড়ে ঝলসে গেছে। নিজেকে নিজের ছুঁতে ঘেন্না করে। বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় মনে হয় শ্মশানে মরার কাঁথা জড়িয়ে শীত কাটালুম সারারাত।

চণ্ডী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কথা মিছে নয়। অরুচির খাওয়া গলায় নামতে চায় না। গা পাক দিয়ে আসে।

—নাড়ি উঠে আসে। এর কি উপায় বল দিকি। আগে এর কোন উপায় না করতে পারলে কিছুতেই মনে জোর পাচ্ছিনে।

—কিন্তু এর আর উপায় কি বল? একদিন তো নয়।

—কোনদিন নয়। একবার যদি আমি ও নৌকোয় পা দিই ওকে আর আমি এদিকে হাত বাড়াতে দোব না। ছুঁতে দোব না।

চণ্ডী হাসলো। বললে, তা হলে তো আয়ান ঘোষের চোখে ধুলোপড়া দিয়ে গোকুল ছেড়ে সরে পড়তে হয়।

—তাই করতে হবে অগত্যা। তা বলে ঠাকুর ঘর থেকে আবার আমি আঁস্তাকুড়ে নেমে আসতে পারবো না।

—কিন্তু তোর ফটিক চন্দর কি রাজি হবে সুদাম শ্রীদাম সুবল ছেড়ে গোকুল থেকে যেতে?

হাসল কেষ্ট। বললে, সেও একটা কথা। তবে আমি আর পারছি না গেঁদাফুল, এই বুকফাটা তেষ্টা নিয়ে ঐ বুড়ো মোষের সঙ্গে পাঁকে ডুবে থাকতে।

চণ্ডী বললে, দরকার কি, তোমার সামনে এমন প্রেমের যমুনা। গা ধুয়ে ঠক ঠক করে জল খাও কিংবা অথৈ জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটো।

—কিংবা ডুবে মরো।

—তাতেও এমন কিছু বাহাদুরী নেই। পিরীত করে অনেকেই অমন ডুবে মরেছে।

—আমিও মরতে ভয় করি না। কিন্তু কেমন করে ঐ দুষমনের হাত থেকে রেহাই পাই বলদিকি। তোর অনেক দুষ্টু বুদ্ধি আছে। একটা বুদ্ধি দে দেখি ভাই।

চণ্ডী গম্ভীর হয়ে বললে, ভেবে দেখতে হবে। আর অমনি অমনি কি হয়। ময়রার দোকানে খাজা তৈরি হচ্ছে—

কেষ্ট বললে, আমার ঘরে খাজা মজুত আছে। বোস। এখুনি খাওয়াচ্ছি। খাজার সঙ্গে গরম চা। কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যেটা দিয়ে নিই।

গাঁয়ের তরুণ মহলে চণ্ডী বিশিষ্টা। চণ্ডী গ্রামের উর্বশী। চণ্ডী সর্বজনীন প্রিয়া। চণ্ডী রূপসী না হলেও সে মনোমোহিনী। তাজা আনাজের মত চিকন তার তনু দেহ। শ্যাম লতার মত দীঘল তার দেহের গঠন। আঁট-সাট মজবুত দেহে স্বাস্থ্যের বন্যা। অফুরন্ত যৌবন। গ্রামীন বন্যতা তার সর্বাঙ্গে। সেই বন্যতাই বুঝি তার দেহের লালিত্য। তার সৌন্দর্যের মাধুর্য। এক মাথা কোঁচকানো কালো চুল। চুলগুলো সদাই আলুথালু। কেউ কখনো পরিপাটি করে, তাকে চুল বাঁধতে দেখে নি। বাঁধলে বোধ হয়

মানাতো না। মুখের উপর এগিয়ে পড়া আলুথালু চুলেই তাকে দেখায় ভালো। এটা যেন চণ্ডীর স্বকীয়তা। শুধু চণ্ডীকেই মানায়। সব চেয়ে আকর্ষণের বড় বড় টানা দুটি চোখ। চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি। দৃষ্টিতে জলভারাবনত শ্রাবণ মেঘের ঘন কালো ছায়া। কখনো বিদ্যুতের ঝলকানি। কখনো মমতায় স্নিগ্ধ। চণ্ডী কখনো রণচণ্ডিকা। কখনো করুণাময়ী অভয়া। ফুলের কোমলতা ও পাথরের রুক্ষতা তার প্রকৃতিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

তাকে বোঝা শক্ত। তাকে চেনা আরো দুষ্কর। তার আকর্ষণ প্রচণ্ড। তার চরিত্র সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি। নিন্দুকের কুৎসায় কলঙ্কিত। অথচ নিশ্চিত জানা নেই কারো কোন তথ্য।

মন তার নিঃসঙ্কোচ। দেহ নির্বিরোধ। মজলিস জমাতে তার জোড়া নেই। মেয়েদের মজলিসই শুধু নয়। পুরুষের মজলিসেও সে অপরাজেয়। হাসিতে খুশিতে, রঙ্গরসে সরগরম করে রাখবে তার সমবয়সী তরুণ বন্ধুদের। তার বন্ধু অনেক। শত্রু ততোধিক।

তার কাছে শত্রু মিত্রে কোন ভেদ নেই। অর্থাৎ তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিন্দা প্রশংসার বাইরে। তার চরিত্রের অপবাদ যেমন প্রচলিত, তেমনি বহুপ্রচলিত তার পরহিতে নিজেকে উৎসর্গ করার আন্তরিকতা। ঘনিষ্ঠ ভাবে তার প্রকৃতিকে যারা অনুশীলন করেছে তারাই জানে তার সত্য পরিচয়। সে সর্বজনে অনুরক্তা। সে সবার দাসী। সবার প্রিয়া।

বোষ্টমের মেয়ে চণ্ডী। কোন ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল কুড়মুনে। তার বাবার মৃত্যুর পর স্বামী এসে পলাশীতেই বাস করলো। চণ্ডীকে শ্বশুর ঘর করতে হলো না। গ্রামের মেয়ে গ্রাম ছেড়ে যেতে হলো না। বাল্যের ক্রীড়া সঙ্গিনীরা গেল বিদেশে স্বামীর ঘরে। বাল্যের সমবয়সী পুরুষ সঙ্গিদের সঙ্গে পূর্বের মতই সে

নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতে লাগল। তার উপর স্বামীকে সে ত্বচক্ষে দেখতে পারে না। কাজেই তার অপবাদ বিচিত্র নয়।

চণ্ডীর স্বামী বেলোয়ারী চুড়ি বেচে। মাথার ক্লিপ কাঁটা বেচে। গায়ে-মাখা সাবান ও মাথার সুগন্ধি তেল বেচে। খেলনা বেচে।

স্বামি যায় হাটে। ভিন্ গাঁয়ের মেলায়। গাঁয়ের বিক্রী চণ্ডীই করে। চণ্ডীর সান্নিধ্যের লোভে উঠতি বয়সের ছেলেরা তার বাড়িতে তেল সাবান কিনতে গিয়ে তার সঙ্গে ত্বদণ্ড আলাপ করে আসে। গাঁয়ের বউ-ঝি'রা যায় চণ্ডীর হাতে চুড়ি পরতে। চণ্ডী চুড়ি পরাবার কায়দা জানে।

নতুন বউ কেষ্ট চুড়ি পরতে গিয়েই চণ্ডীর সঙ্গে আলাপ হলো। কেষ্টকে চণ্ডীর ভাল লাগলো। চণ্ডী কেষ্টকে আকর্ষণ করলো।

চণ্ডীর উঠোনে অজস্র গাঁদা ফুল ফুটেছিল। একটা ফুল ছিঁড়ে সে কেষ্টর খোঁপায় পরিয়ে দিল। কেষ্টও একটা পরিয়ে দিল চণ্ডীর খোঁপায়।

ত্বজনে 'গাঁদাফুল' পাতালো।

ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। ত্বজনে ত্বজনকে মন খুলে দেখালো। কারুরি মনে স্বামীর জন্মে নরম মাটি নেই। কোন ঔৎসুক্য নেই। কেষ্টর কথা অবশ্য চণ্ডী প্রথমেই অনুমান করে নিয়েছিল। ঠাকুর্দার বয়সী স্বামীকে কোন মেয়েই প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারে না। চণ্ডীও সমগোত্রের।

স্পষ্টবক্তা চণ্ডী স্পষ্টই স্বীকার করলে, চোখে লাগে না, মনে ধরে না। কী করবো বল। মন তো আমার হাত ধরা নয়। রীতিমত সৌখিন মন। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজপুত্তুরকে স্বপ্ন দেখে। ইনি একেবারে ড়োম ডোক্‌লা। তার ওপর দিনরাত গাঁজার কলকেয় দম দিচ্ছেন।

কেষ্ট মুখে বলবার আগেই চণ্ডীর বুঝতে বাকি রইলো না কেষ্টর মনের গতি। কেষ্টও তাকে গোপন করলো না। অব্যক্ত ব্যক্ত হলো।

চণ্ডী রসের মহাজন। পিরীতি রসের মর্ম জানে। খাঁটি বৈষ্ণব সে। রাধা প্রেমের তত্ত্ব বোঝে। কেষ্টকে সে কোল দিল। তার প্রেমের আকুলতা তার হৃদয় স্পর্শ করলো।....

এই হলো কেষ্ট চণ্ডীর পরিচয় পর্ব। চণ্ডী জানে কেষ্টর গোপন কথা। চণ্ডীর উপর কেষ্টর অখণ্ড বিশ্বাস।

ওদিকে ফটিক পান্নু ঠাকুরের শরণাগত। তাকে পছন্দ করে কেষ্টর জন্যে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দিতে হবে। পান্নুর চেয়ে গাঁয়ের আর কার পছন্দ ভালো। সে কলকাতার সব চেয়ে সৌখিন ধনীর বাড়িতে থাকে। তাদের মেয়েদের জন্যে কেনাকাটা করে।

পান্নু জিজ্ঞেস করলে, কতো টাকা দামের ?

—দিশী তাঁতের একখানা রঙিন ডুরে ক-টাকায় হবে ?

—ভালো নিতে হলে পনেরো থেকে পঁচিশ।

—তাই হবে। ভালো দেখে কিনে দিও। তোমার পছন্দ ভালো ভাই। রঙটা পছন্দ করে দিও। যে রঙ ওকে মানাবে।

পান্নু টেরা চোখে তার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসলো। তার-পর হঠাৎ তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে জিজ্ঞেস করলে, জুটেছিস ? সত্যি করে বল জুটেছিস ?

—ধেৎ। কী যে বলো তুমি পান্নুদা।

—বলনা আমায়। ভয় নেই। আমি কারুকে বলবো না।

—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

—কি বলছিস আমার গা ছুঁয়ে ? 'হ্যাঁ' না 'না' ?

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, না গো না।

পান্নু একটু থেমে একটা সিগ্রেট ধরালে। ফটিককে একটা দিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলে, দুজনে ভাব হয়েছে খুব?

—খুব। আমাকে খুব যত্নআত্তি করে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল আমার সঙ্গে বনিবনাও হবে না। আমি তো ওর সঙ্গে কথাই কইতুম না। ওই যেচে যেচে আমার সঙ্গে ভাব করলে।

পান্নু হাসতে হাসতে বললে, তা করবে না? এমন তাগড়া জোয়ান। চেহারাখানাও ভদ্দর লোকের মতো। ভক্তা বুড়োকে নিয়ে তার চলবে কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফটিক বললে, তা সত্যি। ওর জীবনের সাধ আহ্লাদ সব ডুবিয়ে দিলে। খুব ভালো মেয়ে। তাই হাসিমুখে ওর ঘর করছে।

—ওর ঘর কি আর চিরদিন করবে? মনে জানে এরপর তোর ঘরই ওকে করতে হবে। তার জমি করে রাখছে।

—তোমার সব কথায় ঠাট্টা।

—ঠাট্টা আবার কি। ভক্তা বেটার সব সম্পত্তির সঙ্গে ও-ও ওয়ারিশ সূত্রে আসবে তোর কাছে। কিন্তু ভক্তাবেটা ওকে বাগালে কেমন করে বলদিকি? অমন সুন্দর দেখতে—

—শুধু দেখতে নয় পান্নুদা! রূপে, গুণে।

পথ চলতে চলতে পান্নু বলে, আগেকার কাল হলে জোর করে তুই ওকে কেড়ে নিতে পারতিস।

ফটিক মাথা উঁচু করে বললে, লাভ কি হবে? জোর করেই হোক আর রাজি করেই হোক বুড়োর কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে

নিলে, তখন তো তোমরাই, গাঁয়ের সমাজ আমাদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দেবে।

—তাইতো।... ও তার ভক্তাকে তালাক দিয়ে তোকে নিকে করতে পারে না।

ফটিক নিঃশব্দে অগাধ অসহায় চোখে তার মুখের পান চায়।

পানু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, কুছ্ পরোয়া নেই। তুই চালিয়ে যা। বিপাকে পড়লে আমাকে স্মরণ করিস। উদ্ধারের পথ বাতলে দোব।

—দূর! তা হয় না পানুদা। একি ছেলেখেলা। একটা মেয়ের জীবন নিয়ে কথা। তা ছাড়া যা ভাবছো তা নয়। ওর জাত আলাদা।

—আমি কিছুই ভাবিনি। ভাবছি তোর কথা। তোকে আমরা ভালোবাসি।

পঁচিশ টাকা দাম দিয়ে পানু পছন্দ করে একখানা শান্তিপুরে ডুরে কিনে দিল কেষ্টর জন্য। কচি কলাপাতার মেঝে। জরির নক্সাপাড়। খয়েরী রঙের ডুরে। খাসা মানাবে কেষ্টকে। তারপর একটা ছিটের বডিস্ কিনলো। কিনলো এক বোতল ফুলেল তেল। এক বাক্স সাবান। মাথার কাঁটা ফিতে। সব পানুর পছন্দ মতো। তারপর নিজের জুতো জামা কিনলো।

পানু বললে, কিরে ফটকে, তুই যে বিয়ের বাজার করছিস। ব্যাপার কি বল দেখি। এতো টাকা তুই পেলি কোথা? ভক্তা বেটা দেয়নি নিশ্চয়ই।

—আমাকে দেয়নি। দিয়েছে ওকে। ও দিয়েছে আমাকে।

—হুঁ। না দিয়ে উপায় কি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

কথাটা কানে গেল কিনা ফটিকের কে জানে। তার কল্পনার আকাশে তখন কেষ্টর খুশিভরা মুখখানি ভাসছে। তার মনে রঙ ধরেছে। সেই রঙের ছোপ তার হাসিতে উথলে পড়ছে।

—খুব হাসি যে রে। তুমি বেটা মরেছো।

ফটিক হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বললে, এখনো মরিনি গো ঠাকুর, তবে খাবি খাচ্ছি। মরলে তুমি জানতে পারবে।

গহরজানের সুর নকল করে গাইতে গাইতে বিষ্টু গোঁসাই আসছে :

……কেষ্ট কথা বোল্। বোলরে ফটিক কেষ্ট কথা বোল্। মধুর কেষ্ট কথা বোল্। রে ফটিক…………

ফটিক বললে, গোঁসাইজীর কাণ্ড দেখো পানুদা। আমি ওকে কতো মান্য করে চলি—

পানু গম্ভীর হয়ে বললে, তা ছাড়া ঠাকুমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কি? গুরুজন বলে কথা।

বিষ্টু থমকে দাঁড়িয়ে বললে, ঠাকুমা তো করনীয় ঘর। শাস্ত্র জানিস? পড়েছিস মুগ্ধবোধ?

—ফটিক পড়ছে। বোধ ওর মুগ্ধ হয়ে এসেছে।

পানু ফটিককে ইশারা করে বললে, চল রে ফটকে আমরা কিছু খেয়ে আসি। বিষ্টুদা তুমি ফটিকের গাড়িতে গিয়ে বোস। আমরা আসছি।

—খুব আছো। আমি খাবো না? বিষ্টু লাফিয়ে উঠলো।

পানু চোখ কপালে তুলে বললে, বলিস কি তুই বিষ্টে। তুই এই মাত্র ইন্দার ওখানে গোগ্রাসে গিলে এলি, আবার খাবি কি রে?

—তাতে কি হয়েছে। আধসের সীতা ভোগ মিহিদানা আর এক কাপ গরম চা। বেশী কিছু খাবো না।

—তুই রাক্ষস্।

—বাড়ি ফিরতে তো রাত দশটা বেজে যাবে।

তিনজনে হাসতে হাসতে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে উঠলো। পানু বিষ্টুকে বললে, খেয়ে নাও যতো পারো কিন্তু কলেরা হলে আমি জানি না।

কথাটা দোকানির কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে আশ্বাস দিল, কোন ভয় নেই। আমাদের খাবার সব ভাতুয়া ঘিয়ে ভাজা।

ফটিক বললে, তবে আর ভাবনা কি দাদা গোঁসাই। পেটের কসি খুলে দাও। লাগে টাকা দেবে পানু বাবু।

পানু বললে, এটা কিন্তু চোৎমাস। মনে থাকে যেন।

আশেপাশের লোকগুলো সব হেসে উঠলো।

গাজন আরম্ভ হয়েছে। সন্ন্যাসীরা হবিষ্যি করে উৎরি নিয়ে বার করেছে। পরেছে গেরুয়া রঙের নতুন ধুতি, গায়ে নতুন গামছার উত্তরীয়। গলায় পৈতের মত নতুন সুতোর উৎরি। মাথার চুল রক্ষ। গায়ে চন্দন। গেঁরুয়া মাটি, নতুন কোড়া কাপড় আর চন্দন মিলে একটি অপূর্ব গন্ধ সন্ন্যাসীদের গা থেকে বাতাস ভরিয়ে তোলে। কম হলেও প্রায় সত্তর জন বার করেছে। সকল জাতের হিন্দু এবং সকল বয়সের লোক। আঠারো কুড়ি থেকে ষাট পঁয়ষট্টি পর্যন্ত। শিবতলা জমজমাট। ঢাকের বাজনা আর বুড়ো-শিবের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত : বুড়োশিবের চরণে সেবা লাগে, ঈশানেশ্বরের চরণে সেবা লাগে, পার্বতি নাথের চরণে সেবা লাগে।

আজ খিন্নিতলার গাজন। কাল শিবতলার গাজন। কুড়মুন আর পাঁড়ুই-এর সন্নাসীরা শিবতলায় আসবে। পরশু গ্রামের সন্ন্যাসীরা সেজে পাঁড়ুই আর কুড়মুন যাবে। পরের দিন ভোরে মরার মাথা খেলা। তারপর সংক্রান্তির দিন উৎরি খুলবে। চড়ক পূজোর দিন। প্রায় সপ্তাহব্যাপী উৎসব। গাজনের মধ্যে দুরাত্রি থিয়েটার হবে শিবতলায়।

খিন্নিতলার গাজনে শিবকে পালকীতে চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হবে। খিন্নিতলায় আসবে, আড়েপুকুর (আড্যি পুকুর) ঘাটের ভগ্নপ্রায় ঈশানেশ্বরের মন্দিরে যাবে। উত্তরপাড়ায় যাবে শোভাযাত্রা করে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে। বাদ্যদল থাকবে

পুরোভাগে। মূল সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীদের আচার্য বা সর্দার সন্ন্যাসী বেত হাতে আগে আগে যাবে। মধ্যভাগে একখানি ছোট পালকী। ছ'জন সন্ন্যাসী তার বাহক। কোন সামন্ত যুগে তৈরি হয়েছিল এই পালকিখানি কে জানে। তবে আজো অক্ষত ও অটুট আছে। বৎসরান্তে গাজনের সময় বোধ হয় এর অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। পালকীতে সিংহাসনের উপর বোধ হয় বাবা বুড়োশিবের কোন প্রতিভূ শিলাখণ্ড বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। বাবা তো অনড়। নেশায় বুঁদ হয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন। প্রতিনিধি পাঠিয়েই কর্তব্য সারেন। তা ছাড়া বয়সের সঙ্গে স্থবির হয়ে পড়েছেন। শোভাযাত্রার পেছনে সন্ন্যাসীর দল। বাবার জয় দিতে দিতে যাবে।

পরের দিন অপরাহ্নে শিবতলায় বিশেষ জনতা। দুটি বিভিন্ন গ্রামের সন্ন্যাসীরা আসবে এই গ্রামে। গ্রামের সন্ন্যাসীরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, শিবতলার প্রান্তে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। বাইরের সন্ন্যাসীরা ঢাক বাজিয়ে নাচতে নাচতে আসবে শিবতলার দিকে। গ্রামের সন্ন্যাসীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কোলাকুলি করে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

গ্রামের বুকচিরে শিবতলা দিয়ে যে রাস্তাটি সরান পর্যন্ত চলে গেছে সে রাস্তাটি সত্যই অপূর্ব। এ ধরনের সোজা রাস্তা বাঙলার পল্লীতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কাক উড়ে যাওয়ার মতই সিদে চলে গেছে গ্রামের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে। সেই পথের দুধারে মেলার দোকান বসে। জনস্রোতে গ্রাম থৈ থৈ করে। দর্শকের ভিড়ে গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে। কত রকমের নরনারী। বিচিত্র তাদের বেশভূষা। সাঁওতাল মেয়েরা আসে মেলায় নাচ দেখাতে। রঙিন শাড়ি, খোঁপায় ফুল, গলায় ও কোমরে বড় বড় পুঁতির মালা।

পুরুষদের মাথায় পালক। ঝাঁকরা চুলে লাল ফেট্টি বাঁধা। কোমরে কাজ করা কোমর বন্ধ। গলায় মাদল।

কেষ্ট যাবে শিবতলায় গাজন দেখতে। খাক্রার পুতুল দেখতে। পৌরাণিক কাহিনীর পুতুল সব। শিবের বিয়ে। দক্ষযজ্ঞ। সতীর দেহত্যাগ। আরো অনেক।

চণ্ডী কেষ্টকে সাজিয়ে দিচ্ছে। চণ্ডী নিজে সাজে না। পরকে সাজায়। চণ্ডী রেঁধে নিজে খায় না পরকে খাওয়ায়। সে ভাল রাঁধতে পারে। চণ্ডী নিজে কখনো গুছিয়ে চুল বাঁধে না। সে পরের বউ-এর চুল বেঁধে দেয়। তার চুল বাঁধার খ্যাতি গ্রামে বহু প্রচলিত। চণ্ডী চুড়ির ব্যবসা করে। গাঁয়ের বউঝিকে চুড়ি পরায়। নিজে কখনো পরে না। এ চণ্ডীর স্বভাব। বোধ হয় সে পরকে ভালবাসে। নিজেকে ভালোবাসে না। নিজের ওপর তার কোন মমতা নেই।

কেষ্টকে আজ সে মনের মত করে সাজিয়ে দিল। চুল বেঁধে দিল পরিপাটি করে। গুছিয়ে পরিয়ে দিল ফটিকের কেনা শান্তিপুরে ডুরে শাড়িখানা। গায়ে দিয়ে দিল নতুন সেমিজ আর জামা। কপালে এঁকে দিল সিঁদুরের টিপ। দুটি ভুরুর মাঝে খয়েরের টিপ। চোখের কোলে কাজলের রেখা। ঠোঁট রাঙিয়ে দিল তরল আলতার গুপি দিয়ে। কেষ্ট বাধা দেয়, আঃ! কী করছিস গেঁদাফুল!

চণ্ডী বলে, বিয়ের কনে সাজাচ্ছি। ছোকরা নাগরের মনে ধরা চাইতো!

কেষ্ট তার গালে ঠোনা মারে। গদগদ কণ্ঠে চুপি চুপি বলে, মনে ধরাবার জন্যে এতো সাজতে হয় না লো। তার মন আমার গোবর নিকোনো শাড়ির আঁচলে বাঁধা।

চণ্ডী বলে, তবু তার মনের চোখকে আরাম দেবে। তোর রূপের ঝাঁজ তার মনের আগুনকে উস্‌কে দেবে।

কেষ্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ছেড়ে দে ভাই ও-সব কথা। মিছে শান্ত মনকে অশান্ত করা।

চণ্ডী ভ্রূভঙ্গি করে বললে, বেশ গো ফটিকের নতুন ঠাকুমা। বেশ গো ভক্ত মালিকের নতুন বউ।

—মরণ আর কি ?

—তবে কি বললে তুই খুশি হবি তাই বল।

—চণ্ডী বোষ্টমীর গেঁদাফুল।

চণ্ডী হাসতে হাসতে বললে, আর্শিতে একবার নিজেকে দেখ। আমি পুরুষ হলে অবধারিত তোর প্রেমে পড়তুম। আজ কিন্তু গাঁয়ের অনেক ছোঁড়া বুড়ো তোর প্রেমে লুটোপুটি খাবে তা বলে রাখছি।

কেষ্ট কটাক্ষ হেনে তেরছা চোখে বললে, তুই পাশে থাকতে সে ভয় আমার নেই।

চণ্ডী ঠিক বুঝতে পারলে না তার ইঙ্গিতটা। সে বললে, আমি কি তাদের চোখে আঁচল চাপা দোবো ?

—আঁচল চাপা দিবি কেন ? একসঙ্গে দেখুক না দুজনকে। আকাশে চাঁদ থাকতে কি কেউ তারার পানে চেয়ে দেখে রে ? চাঁদ না থাকলে বরং কথা ছিল।

চণ্ডী তার গাল টিপে দিয়ে বললে, ওলো আমি গেঁয়ো জুগী। তুই নতুন। নতুনের চমক বেশী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় চণ্ডী বললে, চল, যাবার সময় একবার বুড়োর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিবি। নতুন কাপড় পরে স্বামী দেবতাকে একটা পেন্নাম করবি চল।

—ঢং করিস না গেঁদাফুল। ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পাবি নে। ফটিক তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।

চণ্ডী মুখ ভেংচিয়ে বললে, ফটিকের হাত ধরে যেতে পারলি নে?

চণ্ডী কেষ্টকে টানতে টানতে ভক্তর কাছে নিয়ে গেল: ও ভক্ত-দা। ওগো ও ভক্ত ঠাকুর্দা!

—কে চণ্ডী নাতনি বুঝি? রাধে রাধে!

—মরণ তোমার! দিনরাত্রি হুঁকো হাতে করে ঝিমুবেই যদি তবে মরতে এমন একটা জলজ্যান্ত চেটো মেয়েকে দখাতে আনলে কেন? নতুন শাড়ি জামা কিনে দিলে, একবার চোখ উলটে দেখো কেমন মানিয়েছে?

কেষ্ট নত হয়ে ভক্তকে গড় করল।

—আমার কেষ্টকলি? আহা হয়েছে। হয়েছে। বাঃ, দিব্যি মানিয়েছে তো। চেনবার জো নেই। আমাদের ফোটকের পছন্দ আছে। বারো টাকায় দিব্যি শাড়িখানি কিনেছে। জানো চণ্ডী নাতনি!

কেষ্ট মুখ টিপে হাসল। ফটিক ভক্তকে হিসেব দিয়েছে বারো টাকার শাড়ি।

চণ্ডী চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, বারো টাকা? বেশী নিয়েছে। ফটিককে ছেলে মানুষ পেয়ে দুটো টাকা ঠকিয়েছে। দশ টাকা হলেই ঠিক হতো।

কেষ্ট চণ্ডীর গা টিপলো।

চণ্ডী বললে, তবে ফটিকের পছন্দ ভাল। যেমন পছন্দ করে ঠাকুমা এনেছে তেমনি পছন্দ করে শাড়ি কিনেছে। এ রঙটিতে কেষ্টকে যেমন মানিয়েছে এমন আর কোন রঙে মানাতো না।

ভক্ত একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলে, বেশ মানিয়েছে কি বলো ?

—তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছো নাকি ? চোখ মেলে দেখো না। চক্ষু সার্থক করো।

ভক্ত রসিকতা করে বললে, বয়েস বাড়লেও চণ্ডী, চোখ কান এখনো ঠিক আছে। দেখে শুনেই কেষ্টকলিকে আমি বেচে নিয়েছি।

সশব্দে হেসে উঠলো ভক্ত। চণ্ডী মাথা দুলিয়ে বললে, তোমার চোখ কি ভুল করে ? শকুনির চোখ গাছের মগডাল থেকেও ভাগাড়ের গরু ছাগল চিনতে পারে।

ভক্ত হাসলো। কেষ্টর পানে চেয়ে তার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

চণ্ডী হাসতে হাসতে বললে, তা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে না কেন ভক্তদা! পাঁচজনে তোমাদের যুগল রূপ দেখে চোখ জুড়োতো।

কেষ্ট তার গায়ে চিমটি কাটলো।

—উঃ! তুই কেনে অমন করছিস লা ? তোর বর তোরই থাকবে, তা বলে কি আমরা দুটো রঙ্গরসও করতে পাবো না। তোকে এমন করে ঘষে-মেজে সাজিয়ে দিলুম কার জন্যে ? ওর জন্যে না আমার জন্যে! বর বর করে মলো। তোর মতো বর-ক্যাঙলা মেয়ে খুব কম দেখেছি। তবু যদি—

চণ্ডী যেমন দপ করে জ্বলে উঠল, তেমনি দপ করে নিভে গেল। যেন খড়ের আগুন। সে মধুর হাসিতে ঠোঁট ভিজিয়ে ভক্তকে বললে, মাইরি বুড়ো, তোমার কপাল ভালো! এ বয়েসে এতো পিরীতের কথা পুরাণে নেই। কী করে মজালে তুমি মেয়েটাকে ? উঃ! কী ভালোই বেসেছে তোমাকে এই ক'টি দিনে! একদণ্ড চোখে না দেখলে থাকতে পারে না।

সজ্জিতা কেষ্টর দেহের উপর ভক্তর লোলুপ চোখ দুটো আছারি পাথারি করছে। কেষ্ট মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে গল গল করে ঘামছে।

ভক্ত একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলে, একটু আরাম আয়াসের জন্যেই তো ভাই ওকে এই বয়সে নিয়ে আসা। একা ঘরে দম আটকে আসতো রে চণ্ডী। বুক ফেটে যেতো।

—যাক এ যাত্রা বেঁচে গেছো। তোমার কপাল ভালো। তবে—

হেঁ হেঁ করে গলগলিয়ে হাসে ভক্ত। তার চোখে মুখে উল্লাস ফেটে পড়ে।

চণ্ডী বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে চাপা গলায় বলে, তবে হাম হাম করে গিলো না যেন। কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হবে না।

বাইরে এসে কেষ্ট চণ্ডীকে জড়িয়ে ধরে হেসে লুটোপুটি।

চণ্ডী বললে, মরুক বিষের জ্বালায় ছটফট করে।

মেঘ ডাকার মত গুরুগুরু শব্দে একসঙ্গে কতকগুলো ঢাক বাজছে। দলে দলে লোক চলেছে শিবতলার দিকে। ঝড়ের শব্দের মত আকাশ বাতাস মথিত করে জন কোলাহল শোনা যাচ্ছে। কুড়মুনের সন্ন্যাসী বোধ হয় এসে পড়ল। ছেলেমেয়ের দল ছুটছে আর বলছে, এসে গেল কুড়মুন।

কেষ্ট বললে, একটু পা চালিয়ে চল ভাই। দাঁড়িয়ে দেখবার একটু জায়গা পাবি না। দেখছিস লোকের ভিড়। শিবতলায় এতো লোকের জায়গা হবে কোথা?

—আর কারুর না হোক তোর আর চণ্ডীর হবে। চণ্ডীকে অনেকেই জায়গা ছেড়ে দেবে।

হন হন করে কেষ্ট এগিয়ে চললো।

—ছুটিস্ নে। হোঁচট খাবি। গিয়ে দেখবি চলনা। ফটিক চন্দর তোমার জায়গা করে পথ চেয়ে আছে।

কেষ্টর মুখে প্রসন্ন হাসি। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, তা সে বলেছে।

চণ্ডী বললে, মাটিতে জায়গা না পাস, ফটিক কাঁধে করে বকুল গাছের ডালে তুলে দেবে। যার ফটিক আছে তার আবার ভাবনা কি?

মুচকি হেসে কেষ্ট বললে, তা সত্যি। দেখবি চলনা, তাকে কি রকম সাজিয়ে দিয়েছি। কী সুন্দর মানিয়েছে। বর্ধমানে পান্নু ঠাকুর তার ঘাড় চেঁচে চুল ছাঁটিয়ে দিয়েছে।

পালেদের বাড়ি পেরিয়ে ত্রিপুর ভোলার দোলমঞ্চ থেকে মেলার দোকান সুরু হয়েছে। জন জটলা সুরু হয়েছে। ভিড় ঠেলে পা বাড়ানো যায় না। পূব-পাড়ায় গলির মুখে রামবেনের দোকানের সামনে ভালুক নাচ হচ্ছে। যতো ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে সেইখানে। সেই জনতরঙ্গ পার হয়ে শিবতলায় যাওয়া দুঃসাধ্য। দুজনে একপাশে হাত ধরাধরি করে সরে দাঁড়াল।

কেষ্ট কাঁদ কাঁদ হয়ে চণ্ডীকে বললে, দেখলি তো। তুই রঙ্গরস করতে করতে দেরি করলি। এখন যাবি কেমন করে?

—আমি তোকে নিয়ে গেলেই তো হলো? ব্যস্ত হচ্চিস কেন?

বলতে বলতে এগিয়ে যেতেই ভিড় ঠেলে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো ফটিক, পান্নু আর নবদ্বীপ গোঁসাই।

পান্নু পথ আগলে দাঁড়াল। তার গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী। হাতে একগাছা বেতের ছড়ি। মুখে সিগ্রেট।

ফটিক বললে, এতো দেরি করলে কেন? কখন থেকে তোমাদের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পান্নু বললে, তবে আর কি? খুব বাহাদুরী করেছো। এখন ওদের দত্তদের বৈঠকখানা দিয়ে পার করে দে।

চণ্ডী হেসে উঠলো।

পান্নু বললে, হাসি রাখ চণ্ডী। দুজনে চলে যা সোজা আমাদের থিয়েটারের যেখানে ষ্টেজ বাঁধা হচ্ছে। কৈবোতদের কুসমী তোদের জায়গা করে রেখেছে।

কেষ্টতে ফটিকে চোখাচোখি হলো। চোখে চোখে তাদের কি কথা হলো ভগবান জানেন। ফটিক ফিস ফিস করে বললে, পান্নু-দা। পান্নু ঠাকুর।

দত্তদের বৈঠকখানার ফটকে এসে চণ্ডী পান্নুকে বললে, একটু দাঁড়াও গো ঠাকুর। ফটিকের ঠাকুমাকে একটু পায়ের ধূলো দাও।

পান্নু বললে, এতো ভিড়ে নয়।

কেষ্ট তাকে আনত ভঙ্গিতে প্রণাম জানালো।

পান্নু বললে, কল্যাণ হোক। পূর্ণ হোক তোমার মনের কামনা। ফটকে আগেই আমার আশীর্বাদ আদায় করে নিয়েছে।

ওরা চলে গেলে পান্নু ফটিককে জিজ্ঞেস করলে, কি রে ফটকে, শাড়িতে তোর ঠাকুমাকে কি রকম মানিয়েছে?

নবদ্বীপ গোঁসাই বলে উঠলো, ওঃ। মাইরি! চোখ গেল!

পানি ফট করে তার গায়ে এক ঘা বেত বসিয়ে দিয়ে বললে, শালা গাঁওয়ার! পরের বউকে দেখে চোখ গেল? কথা বলতে জানিস নি? শুধু চোখ যাবে না। মুখ খসে যাবে যে।

ফটিক হাসলো। নবদ্বীপও নিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে উঠলো।

পান্নু বললে, শালা চাষা! মার খেয়ে কি কেউ হাসে নাকি রে গর্দভ?

কথাটা চাপা দিয়ে নবদ্বীপ বললে, আমাদের পাড়ার থাকার কাছে উত্তর পাড়ার থাকা যেন মিট মিট করছে—না রে ফটকে? নবদ্বীপের মিস্ত্রি বলে কথা।

পান্নুর উস্কানি পেয়ে ফটিক বললে, সব কি সমান হয় গোঁসাই? তাই যদি হতো তাহলে তোমাতে আর পান্নুদা'তে এমন আসমান জমি ফারাক কেন? পান্নুদার কাছে তো তুমি সামতাল।

নবদ্বীপ চটেছে। বললে, আর তুই বেটা কাত্তিক।

পান্নু বললে, তোর কাছে ও গোরা। তোকে যে না চেনে, সে কি ভাবতে পারবে যে তুই গোঁসাই-বাড়ির ছেলে।

নবদ্বীপ মনোক্ষুন্ন হয়ে বলে, কী করবো বল। যাকে যেমন ভগবান গড়েছেন।

পরের দিন গাঁয়ের সন্ন্যাসী সাজবে। বিচিত্র সে সাজ। এটা পলাশীর সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য। কবে থেকে এ প্রথা চলতি হলো, কে করলো এর পরিকল্পনা, কারুর জানা নেই। আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। আজো চলেছে। পরেও চলবে। বাড়িতে সন্ন্যাসী সাজানো গৃহস্থের কল্যাণ। বারব্রত লক্ষ্মীপূজার মতো। সাজানোর ব্যয়ভার বহন করবে গৃহস্থ। সন্ন্যাসীর সেবার জন্য তাকে ফল মূল দেবে।

অপরাহ্ণে সন্ন্যাসীরা বিচিত্র সাজে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে গ্রাম থেকে যাবে প্রতিবেশী গ্রাম পাঁড়ুই এবং কুড়মুনে। কুড়মুন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানে তাদের ঢাকি এবং

সন্ন্যাসীরা এসে গ্রামের প্রান্ত থেকে পলাশীর সন্ন্যাসীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রামে নিয়ে যাবে।

প্রতিবেশী গ্রামের মধ্যে এই সহযোগিতা ও প্রীতির আদান প্রদান সত্যই প্রশংসার্হ।

এই সন্ন্যাসী সাজানো নিয়ে গৃহস্থদের মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। কে কতো ভালো ভাবে সন্ন্যাসীদের সাজাতে পারে। মালায়, ফুলের মালায় ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে।

দুপুর থেকে আরম্ভ হবে সন্ন্যাসী সাজানোর পর্ব। রঙিন বিচিত্র একখানি বস্ত্র মাল কোছা দিয়ে পরবে। তার সর্বাঙ্গে মাখানো হবে সাদা খড়ির পোঁচ। মায় মুখে পর্যন্ত। সেই সাদা খড়ির ওপর আঁকা হবে লাল ও কালো তেল রঙের ছোট ছোট ফুল। সে ফুলের ছাপ দেওয়া হয় সচরাচর সোলার ফুল কেটে অথবা শুকনো টেঁপারি ফুল থেকে। তারপর মুখের ওপর গোঁফ ও ভুরু এঁকে দেবে পোটো বা কামার। দুর্গা প্রতিমার অসুরের গোঁফ ও ভুরুর মত। তার পর রূপসজ্জা দেওয়া হবে সেই চিত্রিত দেহে। কাগজের ও ফুলের মালা। গুলঞ্চ ও আকন্দ ফুলের মালা। মাথায় ও কাগজের মালা বেঁধে দেওয়া হবে। সর্বশেষে গহনা। হাতের মনিবন্ধে রূপোর বালা। বাজুতে রূপোর তাবিজ। কোমরে ছোট ঘুঙরের মালা অথবা চন্দ্রহার। পায়ে নূপুর। হাতে তরোয়াল বা হাতিয়ার। তলোয়ার বা হাতিয়ারের ডগায় বেঁধা থাকবে একটি কচি আম। যাত্রা থিয়েটারের টিনের তরোয়াল নয়। সত্যিকার ইস্পাতের ঝকঝকে তরোয়াল। সন্ন্যাসীদের জন্য প্রতি ঘরেই তরোয়াল মজুত আছে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে তরবারি ব্যবহৃত হয় না। দেবতার গহনার মতো, ঠাকুর ঘরের তৈজস পত্রের মতো সন্ন্যাসীর সমস্ত জিনিসপত্র আলাদা তুলে রাখা হয়।

সন্ন্যাসী সাজানো হয়ে গেলে জলযোগ করবে সন্ন্যাসী। ফল, দুধ ও সন্দেশ। সরকারী ঢাকি অর্থাৎ খাস বুড়োশিবের ঢাকি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্ন্যাসী বের করে আনবে। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরে আবার নিজেদের ঢাক আছে। সজ্জিত সন্ন্যাসী ঢাকের বাজনা শুনেই থর থর করে কাঁপতে থাকে। তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। দেখলে মনে হবে কেউ তাকে ভর করেছে। তার চেতনা থেকে সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঢাকের বাজনার তালে নৃত্য করতে করতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সে নৃত্যের ভঙ্গিও অপূর্ব। তরবারি হাতে নিয়ে ব্রতচারী নৃত্যের মত অনেকটা। সে তন্ময় হয়ে ডুবে যাবে সেই নৃত্যের মধ্যে। সে নিজে নাচছে না যেন অন্য কেউ তার ভেতর থেকে তাকে নাচাচ্ছে। নিজেকে সে নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না। নৃত্যচঞ্চল শরীরটা যেন তার নিজের নয়। এ নাচ তাকে কেউ শেখায় নেই। এ নাচ কখনো সে নাচেনি। আজকের পর আর সে এ নাচ নাচতে পারবে না। অদ্ভুত সে নৃত্য। ঢাকিরা তটস্থ হয়ে ওঠে। এমনি নাচতে নাচতে সব সন্ন্যাসী সমবেত হবে শিবতলায়। নাট মন্দিরে গিয়ে শিবকে প্রণাম করবে। মন সন্ন্যাসী প্রত্যেককে বাবার নির্মাল্য দেবে। সেই নির্মাল্য কাপড়ে গুঁজে নিয়ে তারা একত্রে শিবতলা থেকে ঢাকের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে যাত্রা করবে প্রতিবেশী গ্রামের উদ্দেশে।

দশ বারো খানা ঢাক, সঙ্গে ঢোল কাঁসি। সঙ্গে বিচিত্র শবর সাজে সজ্জিত সশস্ত্র ষাট সত্তর জন নৃত্যরত সন্ন্যাসী। সে এক অভিনব মিছিল। আফ্রিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ধর্মোৎসবের নৃত্য মিছিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঢাকের দ্রুতনিনাদে ও সমবেত নূপুরধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। সন্ন্যাসীদের গলার গুলঞ্চ ফুলের

গন্ধে বাতাস ভরপুর। লোকারণ্য শিবতলা যেন এক উন্মথিত সমুদ্র। পরিকল্পনার মৌলিকতা আছে নিঃসন্দেহ।

গভীর রাত্রে সন্ন্যাসীরা যাবে শ্মশান পুজো করতে। ভোরে গ্রামে ফিরে আসবে সেই বিচিত্র বেশী সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ড হাতে নিয়ে। শুষ্ক মাংসহীন করোটি নয়। তাজা নরমুণ্ড। সদ্যমৃতের ছিন্নশীর। রক্ত জমাট বাঁধেনি। চোখ জ্বলজ্বল করছে। তেমনি মরার মাথা নিয়ে সন্ন্যাসীরা নৃত্য করতে করতে আসবে শিবতলায়। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বীভৎসতার মাঝেও বোধ হয় সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্য না থাকলেও রোমাঞ্চ আছে নিশ্চিত। মানুষ রোমাঞ্চের পক্ষপাতী। সেই রোমাঞ্চের আস্বাদেই রাতের অন্ধকারে দেশবিদেশ থেকে, গ্রামাঞ্চল হতে দলে দলে নরনারী আসে মরার মাথা খেলা দেখতে।

শ্মশানে পূজা করে শ্মশানের নিদর্শন নিয়েই কি এরা বুড়োশিবকে দেখাতে আসে? কে জানে।

এ বছর আরো ভিড়। থিয়েটার ভাঙতেই ভোর হয়ে গেল। কেউ আর বাড়ি ফিরবে না। একেবারে মরার মাথা খেলা দেখে সব বাড়ি ফিরবে। কলকাতার লোকও বহু এসেছে থিয়েটারের জন্যে। শিবতলা থেকে অনেকে পথের ধারে গিয়ে বসলো। থিয়েটারের জন্য পাতা সতরঞ্চ তুলে দিয়ে সন্ন্যাসীদের জায়গা করে দিতে হবে।

চায়ের দোকান খোলা। চায়ের দোকানে ভিড় জমেছে। ফটিক খুঁজে খুঁজে কেষ্টকে ডেকে আনলো। কেষ্ট হাই তুলতে তুলতে বললে, একটু চা খাবো রে ফটিক। গেঁদাফুল যে কোথায় গেল কে জানে।

ফটিক হাসলো।

—হাসছিস যে?

—বলবো'খন। চা নিয়ে আসি তুমি এইখানে দাঁড়াও।

মেয়েলী কৌতূহল অসহিষ্ণু। অপেক্ষা মানে না। কেষ্ট অধৈর্য হয়ে বললে, বলনারে। হাসলি কেন শুধু শুধু?

—আঃ! বড়ো ব্যস্ত। বলছি শোন। ঐ আসছে তোমার গেঁদাফুল।

চণ্ডী হাসতে তাদের কাছে এসে ফটিককে বললে, এই যে ঠাকুমাকে আগলাতে এসেছো?

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু তুমি আমার ঠাকুমাকে একলা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে গা দিদি?

চণ্ডী বললে, আ গেল, যেখানেই যাই না। তোর এতো হাসি কেন রে ছোঁড়া?

—আমি তো হাসিনি গো চণ্ডীদি। আমার হাসিহাসি মুখ।

কেষ্ট গলগলিয়ে হাসলো।

—কিলো তোরও যে হাসির ছোঁয়া লাগল। রসের নাতির হাসিহাসি মুখ দেখে নাকি? ভোরের বেলা এতো হাসি ভাল নয়।

ফটিক কেষ্টকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে চায়ের দোকানে গেল।

আগুনের শিখার মতো অন্ধকার মথিত করে দূরে ঢাক বেজে উঠল।

সন্ন্যাসীরা আসছে মরার মাথা নিয়ে। দর্শকেরা হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে গিয়ে সুবিধামত জায়গা করে নিয়ে দাঁড়াল। কলকাতার অতিথিদের জন্য থিয়েটারের স্টেজের ড্রপসিন্ তুলে ভেতরে জায়গা করে দেওয়া হলো।

অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। বাইরে আলো ফুটেছে। দূরে ঢাকের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে সন্ন্যাসীরা আসছে। এক হাতে মুক্ত তরবার অন্যহাতে নরমুণ্ড। দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় স্তব্ধীভূত।

সন্ন্যাসীরা শিবতলায় এসে পৌঁছলো। সন্ন্যাসীর সংখ্যা কমে গেছে। সব সন্ন্যাসী তো মরার মাথা খেলে না। আর অত মাথাই বা পাবে কোথা? কয়েকজন সন্ন্যাসী কাঁচা মাথা এনেছে। বাকি কঙ্কাল।

নৃত্যরত সন্ন্যাসীরা মাথা তুলে ধরে দর্শকদের দেখাচ্ছে। কত রকমের মাথা। পুরুষের মাথা। স্ত্রীলোকের মাথা। কচি ছেলেমেয়ের মাথা।

গ্রামাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে অনেকে শব দাহ করে না। মাটি চাপা দেয়। তা ছাড়া শিশু-শব দাহ করার প্রথা নেই গ্রামবাসীদের মধ্যে। সন্ন্যাসীরা সন্ধান করে সেই শব থেকে মাথা সংগ্রহ করে। গ্রাম এবং দূর গ্রামান্তর থেকে রাতের অন্ধকারে প্রোথিত-শব তুলে তার মাথা নিয়ে আসে। চুরি করে।

মরার মাথা খেলার বাজনা আলাদা। নাচের ভঙ্গিমা আলাদা। সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়। গ্রামবাসীরা বোধ হয় অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই নির্বিকার চিত্তে উৎসবের এই অমানুষিক অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করে।

দ্রুততালে ঢাক বাজছে। মত্ত সন্ন্যাসীরা ঘুরে ফিরে নাচতে নাচতে দর্শকদের সামনে গিয়ে হাত তুলে মাথা দেখাচ্ছে। দর্শকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পিছু হাটছে। আতঙ্কে নয়, বিভীষিকায় নয়। বোধ হয় অশুচি হবার ভয়ে।

আচমকা জনজটলার মধ্যে থেকে ভেসে উঠলো নারীকণ্ঠের বুকফাটা আর্তনাদ। যেন কারুর বুকে কেউ তীর বিঁধে দিল।

আর্তনাদ থেমে গেল। কলবর উঠলো একটি মেয়ে মূর্চ্ছা গেছে। ভিড়ে নয়, আতঙ্কে নয়।

বাগ্‌দীদের মেয়ে। কদিন আগে তার একটি শিশু মারা যায়। তাকে গ্রামের প্রান্তে কাঁকড়াগড়েয় মাটি চাপা দেওয়া হয়। সেই ছেলেটির মাথা নিয়ে এসেছে মণ্ডলদের সন্ন্যাসী শ্যামা হাড়ি।

কচি মাথা। এক মাথা ঝাঁক্‌রা চুল। চোখ দুটো চেয়ে আছে। চোখের কোলের কাজলটুকু পর্যন্ত মুছে যায় নি।

শ্যাম হাড়ি নাকি মা কালির সাধক। তার বাড়িতে বারো মাসের কালি। সে নিজে সেই কালির পূজো করে। শনি মঙ্গলবারে তার ভর হয়। মা কালি তার সঙ্গে কথা বলেন।

দেশ বিদেশের নরনারী আসে মা কালীর কাছে বর চাইতে। রুগ্নের জন্যে, নিঃসন্তানের জন্যে ওযুধ নিতে। মা কালির কৃপায় শ্যামের অবস্থা ভালোই। শনি মঙ্গলবারে তার কালিতলায় বেশ ভিড় হয়। আর বেশ কিছু আমদানী হয়। সেই শ্যাম হাড়ি প্রতি বছরই কাঁচা মরার মাথা এনে গ্রামবাসীদের চমকে দেয়। আর কেউ না আনুক শ্যাম হাড়ি অবধারিত একটা কাঁচা মাথা আনবে। তাই মরার মাথা খেলার অনুরাগীদল শ্যাম হাড়ির দিকে চেয়ে থাকে।

গাঁয়ের লোকে বলে, মা কালি ওর জন্যে মাথা জুগিয়ে রাখেন। স্বপ্নে সন্ধান বলে দেন।

কেষ্ট গ্রামে এসে পর্যন্ত শুনছে, এখানকার বিখ্যাত গাজন আর মরার মাথা খেলার গল্প। বেশ লাগছিল এ ক'দিন তার গাজনের উৎসব। বেশ লাগল তার বাবুদের থিয়েটার। কিন্তু এই মরার মাথা খেলা দেখে তার নারীহৃদয় আতঙ্কে শিউরে উঠলো। তার গা কেঁপে উঠলো, পা কেঁপে উঠলো। গলিত শবের গন্ধে তার নাড়ি ঘুলিয়ে উঠল। সে আতঙ্কে চোখ বুজল। তার দু'চোখ ফেটে জল এলো।

ফেরবার পথে কেষ্ট চণ্ডীকে বললে, এই আমাদের গাঁয়ের ময়রার মাথা খেলা? রক্ষে করো। এমন জানলে আমি থাকতুম না। আমি তো তেরাত্তির ঘুমুতে পারবো না।

—আমারো ভালো লাগেনা।

চণ্ডী যেন কেমন অন্যমনস্ক।

কেষ্ট বললে, এ যেন আনন্দের হাটে মরাকান্না।

চণ্ডী শুনতে পেলে কিনা কে জানে। সে ঘন ঘন পেছন পানে তাকাচ্ছে। যেন কারুর অপেক্ষা করছে।

পেছনে একদল ছেলে আসছে। হাসতে হাসতে চেঁচাতে চেঁচাতে। গলার স্বর শুনেই কেষ্টর বুঝতে বাকি রইলো না যে তারা গ্রামে নতুন আমদানী। স্থায়ী বাসিন্দা নয়।

ময়রার দোকানের চৌমাথায় এসেই চণ্ডী বললে, তুই যা গেঁদাফুল, আমি বাড়ি চললুম।

চণ্ডী হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। কেষ্ট তার ভাবগতিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

চণ্ডী আর আসেনি।

কেষ্ট ফটিককে জিজেস করলে, গেঁদাফুলের ব্যাপার কি বলতো? টিকি দেখবার জো নেই। নীলের ঘরে বাতি দিতে গিয়ে সেদিন কতো খোঁজাখুঁজি করলুম, কোথাও পেলুম না।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, আমি কি জানি।

—একবার দেখা করে আসতে বলিস না।

—না। এখন তার সময় হবে না।

ফটিক তার পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভ্রুভঙ্গি করে মুখ টিপে হাসল।

—কেনে, সময় হবে না কেনে?

ফটিক বললে, তোমার সে কথায় দরকার কি? তার এখন অনেক কাজ।

—কী এমন অনেক কাজ?

—সে কথা আমি বলতে পারবো না।

ফটিক দুষ্ট হাসি হাসে। কেষ্টর ভালো লাগে তার মুখের এই চোরা হাসি। সত্যিই ওর হাসি হাসি মুখ।

কেষ্ট ও হাসে। জিজ্ঞেস করে, কী এমন কথা যে আমাকে বলতে পারবি নে।

—কাজ কি ভাই পরের কথায়। না শোনাই ভালো।

কেষ্টর বুঝতে বাকি থাকে না যে একটা গোপন কিছু তাকে বলবার জন্যে ফটিক হাঁসফাঁস করছে অথচ বলছে না দুষ্টুমী করে।

কেষ্ট মুখ ভার করে অভিমান ভরা কণ্ঠে বললে, বেশ বলিস না। আমাকে বলবি কেনে?

—এই দেখো। আবার মুখ ভারি করছো কেন? বললে হবে কি, তোমরা মেয়েছেলে পেটে তো কথা রাখতে পারবে না।

—বেশ তো বলিস না। কে বলতে তোকে সাধছে।

—নাঃ। মুস্কিল করলে তুমি। তুমি না শুনে ছাড়বে না। বেশ বলছি। কিন্তু কথা চালাচালি হলে আমার রক্ষে থাকবে না। চণ্ডী বোষ্টমীকে তো জানো না। খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবে।

—কী, বল ভাই ফটিক। তোর গা ছুঁয়ে বলছি। কারুকে বলবো না। তোর কথা কি কারুকে বলতে পারি?

ফটিক তার খুব কাছে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে, চণ্ডীদি, মেজদাকে ভালোবাসে।

—মেজদা কে?

—ঐ যে মণ্ডলদের বাড়ির—যে পিয়ারা সেজেছিল। ভালো গান গায়।

—ওঃ। সত্যি ?

—হ্যাঁ। কিন্তু খবর্দার কথা যেন ছ-কান না হয়।

—দূর! খেপেছিস ? হ্যাঁরে, তা উনিও কি, মেজদাও কি—?

হাসলো ফটিক : মেজদা কিছুই জানে না। বোঝেও না বলে মনে হয়।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? ওর ফরমাশ খাটতে পেলেই চণ্ডীদি সগ্‌গ হাতে পায়। যে কদিন ও এখানে থাকবে সে কদিন আর তার কোন কাজ নেই। ওদের ঠাকুরের পালার সময় চণ্ডীদি ও-দের ঠাকুর সেবা করে। আর মেজদা এলে ঠিক তেমনিভাবেই তার সেবা করে। ওর চোখে মেজদা দেবতা। ও ঠিক দেবতার মতোই ওকে ভক্তি করে আর ভালবাসে।

—তা তুই জানলি কেমন করে ?

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, কেনে, আমার কি চোখ নেই ? কিছু দেখতে পাই না, না কিছু বুঝি না ?

কেষ্ট কটাক্ষ হেনে তির্যক ভঙ্গিতে বললে, তুই ভালোবাসার কিছু বুঝিস নাকি ? ছাই বুঝিস।

—না, কিছু বুঝি না। তবে যা বললুম, তা খাঁটি সত্যি। মেজদা চলে যাবার জন্যে ও বুক পেতে দেবে। মেজ-দা যে মাটিতে পা দেবে সে মাটি তুলে নিয়ে ও গায়ে মাখবে। মেজদার জন্যে ও আগুনে ঝাঁপ দেবে। একটু হেসে কথা বললে ও কেতাথ্য হয়ে যাবে।

—তবু, তুই বলছিস, মেজ-দা কিছুই জানে না।

—জানলেও গ্রাহ্য করে না। তবে চণ্ডীদিকে ওদের বাড়ির সবাই স্তেহোঁ করে।

কেষ্ট আপন মনে বললে, আমি তাই ভাবতুম—

—কি ?

—সোয়ামীকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, অথচ আর কারুকে ভালবাসে না ? তাই কি হয় ? এক জনকে না ভালবেসে মানুষ বাঁচে।

—তবে গাঁয়ে যে ওর নামে এতো কুচ্ছা ও সব বাজে। ও গোখরো সাপ। ওর বিষের জ্বালায় অনেকেই ছটফট করছে। মুখে ইয়ারকি করো, রসিকতা করো ও মাথা তুলবে না। তার বেশী এগিয়েছো কি চক্কর তুলে দাঁড়িয়েছে। ওর ব্রজবুলি তো শোননি।

কেষ্ট হাসলো। হাসলো, কিন্তু সব যেন ওর ঘুলিয়ে গেল। চণ্ডী যেন নতুন রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে চণ্ডীকে সে চেনে না।

ফটিক বললে, লক্ষ্মিটি, দোহাই তোমার, ভুলেও যেন ভাই এ কথা ওর সামনে উচ্চারণ করো না।

—না রে না।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, পরশু ভোরে সেই যে থিয়েটার ভাঙতেই সরে পড়েছিল। সে মেজদাকে দেখতে গিয়েছিল। যে কদিন মেজদা এখানে থাকবে ওর হুঁস্ পব্ব থাকবে না। ও আলাদা মানুষ।

—সত্যি, তাই এখন মনে হচ্ছে।

—ও সৃষ্টিছাড়া মেয়ে। মেজদা ছাড়া কেউ ওর চোখে পুরুষ নয়।

কেষ্ট হাসলো।

॥ সাত ॥

প্লাবনের মতো ক-দিন বাইরের জনস্রোত এসে গ্রামখানাকে তোলপাড় করে দিয়ে গেল। যারা এসেছিল, তারা চলে গেল। গ্রামের বাসিন্দা যারা পেটের দায়ে বাইরে থাকে তারাও ফিরে গেল। রইলো যারা গ্রামের মানুষ। চিরদিন যারা গ্রামে থাকে। উৎসবের ঘনঘটা থেমে গেল। গ্রামের বুকজুড়ে নেমে এলো একটা অবসাদ। কালো অবসাদ। গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে। আলো নিবে গেছে। সব যেন কেমন মুহ্যমান। স্তিমিত। উত্তেজনার আলস্য যেন সকলকে আঁকড়ে ধরেছে। ঘরে পড়ে পড়ে কদিন সব ঘুমোল। উৎসবমণ্ডপ শিবতলা খাঁ খাঁ করছে। যেন মুখ থুবড়ে উপুর হয়ে পড়ে আছে। জায়গায় জায়গায় লেগে আছে উৎসবের দাগ, চোখের জলের দাগের মতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো শূন্যচোখে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। কি যেন খোঁজে। কি যেন হারিয়েছে।

চণ্ডীর পাত্তা নেই। কেষ্ট ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে সংসারের কাজকর্ম সারে।

ফটিক নতুন ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কেষ্ট ঘুম ভাঙিয়ে তাকে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে তাকে গিয়ে দেখে আসে।

ঘুমন্ত ফটিককে সুন্দর দেখায়। মাটির ওপর গা-এলানো বিছানাটা যেন তার শ্রান্ত দেহকে আঁকড়ে ধরে আছে। সে আরামে আবিষ্ট হয়ে গেছে। কাঁবা বিছানা। মাটির ওপর একখানা খেজুর পাতার

চেটাই। তার ওপর একখানা কম্বল। কম্বলের ওপর একখানা পুরোনো কাপড়ের কাঁথা। মাথায় একটা বালিশ। বালিশের ভেতর মুখটা ডুবে আছে। মাথার এলোথেলো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। কচি মেয়েলি মুখ। ঘুমের ঘোরেও যেন হাসছে। কেষ্টর বড় ভাল লেগেছে ফটিকের সেই কথাটা ঃ আমি তো হাসিনি। আমার হাসি হাসি মুখ। সত্যিই হাসিহাসি মুখ। টোল খাওয়া ঘুমন্ত মুখেও যেন হাসি লেগে আছে।

ফটিককে তার অপরূপ মনে হয়। মনে তার দোলা লাগে। দেহের রক্ত চনমন করে মাথার পানে ঠেলে ওঠে। সে হেলা কোমর সোজা করে চোখভরা ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে থাকে।

পেশল বলিষ্ঠ দেহ। সুঠাম সুগঠিত। লম্বা মজবুত হাত। হাতের থাবাটা বড়ো। আঙ্গুলগুলো নিটোল। সুপুষ্ট একখানা নিস্পন্দ হাত বিছানার একপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কেষ্টর মনে মমতার সঙ্গে একটা আকুলতা আছে। অদ্ভুত, অবর্ণনীয়, প্রচণ্ড সে আকুলতা। ওই ঘুমন্ত তরুণের বলিষ্ঠ বাহুর নিচে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার একান্ত বাসনা তাকে জর্জর করে তোলে। একটা অস্থির ভাবাবেগ তার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার দেহে কাঁপুনি ধরে। সে মাথার এলো চুলগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ফাঁস দিয়ে বাঁধে। সে আঁচলটাকে টেনে কোমরে জড়ায়। যেন নদিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবে।

তলিয়ে তাকে যেতেই হবে। তা ছাড়া গতি নেই। কেষ্টর হাঁপানি ধরে। নিজের বুকের ধকধকানিতে সে চমকে ওঠে। যতটা নিশ্বাস সে বুক দিয়ে টেনে নেয় ততটা সে ছাড়তে পারে না। বুকের তলায় আটকে যায়। যতটা আশা নিয়ে সে এগিয়ে যায়,

ভয়ে আর ভাবনায় তার চেয়ে বেশী পেছিয়ে আসে। কেলেঙ্কারির ভয়। ভবিষ্যতের ভাবনা।

কিন্তু বাঁচতে হবে তো। এর নাম কি বেঁচে থাকা নাকি?

কেষ্ট মনে বল সঞ্চয় করে ফটিকের মুখপানে চেয়ে।

ভরা দুপুর। বাইরে রোদে কাঠ ফেটে যাচ্ছে। রোদে কেষ্টচূড়া ফুলগুলো দুলছে। বাঁশ বনে একটা কোকিল গলা ফেঁড়ে চেঁচাচ্ছে। রোদে মাটি শুষে নেবার গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কেষ্টর মনে আশা জাগে। একটা কিছু ঘটবে নিঃসন্দেহ। অঘটন কিছু। কিন্তু কি যে ঘটবে কেষ্ট আঁচ করতে পারে না।

যা ঘটে ঘটে যাক। কেষ্ট আর অপেক্ষা করতে পারে না।

গামছা মাথায় দিয়ে চণ্ডী এসে ডাক দিল।

—কৈ রে গেঁদাফুল?

—কি ভাগ্যিস মনে পড়ল। একেবারে যে ডুমুরের ফুল হয়েছিস?

কেষ্ট রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসেছিল।

চণ্ডী একগাল হেসে বললে, ডুমুরের ফুলই তো। ডুমুরের ফুল যেমন চোখে দেখা যায় না। ভালোবাসাও তেমনি চোখে দেখা যায় না। ভালবাসা গোপনে আসে। পা টিপে টিপে। অজান্তে কখন যে মনের মাটি ফুঁড়ে মাথা চাড়া দেয় আর কখন যে ডালপালা গজায় বোঝা যায় না।

—তা সত্যি। কিন্তু কোথায় ছিলি কদিন?

—কেন, আমার মনের মানুষের কাছে। পিরীতের লোকের কাছে। তুই কি ভাবিস আমার পিরীতের বয়েস পার হয়ে গেছে? আমার মনে রসকস নেই?

—ও মা, তা কেন থাকবে না? তুমি রসের খনি। কিন্তু

মনের মানুষটি কে বলবি নে? তাকে চেনবার জন্যে ছটফটিয়ে মরছি। বলবি নে?

চণ্ডী কি বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন কথাটা চেপে গেল। তার মুখের ভাব বদলে গেল। হাসির রূপ বদলে গেল। সে হাসতে হাসতে বললে, আমাকে কি এতো বোকা ঠাউরেছিস? ঢাক ঢোল পিটিয়ে কি পিরীত করে নাকি? পিরীত করবি লুকিয়ে। মহাজন বলেছেন:

"গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিকরাজ॥"

কেষ্ট মুখভার করে বললে, কিন্তু আমি তো কোন কথা তোর কাছে লুকুইনি।

—আমার কাছে লুকোলে তোমার গতি হবে কি করে? আমি যে তোমার অগতির গতি।

কেষ্ট হাসলো।

চণ্ডী বললে, হাসছো হাসো। কিন্তু শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে। খেংরা নিয়ে তেড়ে আসবে আমাকে। তোমার কপালে আমি তেঁতুল গুলতে বসেছি।

—কি রকম?

চণ্ডী গম্ভীর হয়ে বললে, তোমার রসের নাগর ভক্তহরিকে নিয়ে আমি দেশছাড়া হয়ে যাচ্ছি।

হেসে উঠলো কেষ্ট।

—হাসি নয়লো ছুঁড়ী। হাসির কথা নয়। সত্যি! জলজ্যান্ত সত্যি। তীর্থে যাচ্ছি। প্রেমের বৃন্দাবনে রাধারাণী দর্শন করতে

যাচ্ছি। বৈষ্ণব চূড়ামণি পরমভক্ত ভক্তহরি রাবাজীর সেবাদাসী হয়ে।

—মরণ দশা!

চণ্ডী চোখ ঘুরিয়ে বললে, তোর হিংসে কেনে লা? ক্ষেমতা থাকে ভাতারকে আটকে রাখ। তবে বুঝবো তোর যৌবন।

কেষ্ট বললে, আমার আটকে রাখবার দরকার নেই। তোমার মহাপুরুষকে নিয়ে তুমি উধাও হয়ে যাও। আমার হাড়ে বাতাস লাগুক।

—আমার বকসিস?

—বকসিস দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে। আমি তোর ছোট বোন। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই বুঝিয়ে বল।

চণ্ডী একচোট খুব খানিক হাসলো। কেষ্ট তার হাসি থামাবার জন্যে তার মুখে দুটো পান গুঁজে দিল।

চণ্ডী বললে, তোর জ্বালায় আমি মলুম গেঁদাফুল। তোদের মিলন ঘটাবার জন্যে আমায় ললিতে সখি সাজতে হলো।

কেষ্ট হাঁপিয়ে উঠেছে। বললে, বল ভাই—!

চণ্ডী বললে, গাঁয়ের অনেকে বৃন্দাবন যাচ্ছে, রসিক কাকার সঙ্গে। রাজলক্ষ্মী মাসি, বামুনদের মালতী আরো অনেক মেয়ে পুরুষ যাবে। আমারো কেমন ইচ্ছে হলো, গেলে হয়। গেলুম কাকা গোঁসাই-এর কাছে। মহাপ্রভুর পিঁড়েয় কাকা গোঁসাই আর তোমার ভক্ত বসে গল্প করছিল। শুনলুম ভক্তকেও জপিয়েছে কাকা গোঁসাই। সে ও যাচ্ছে। আমার মনটা খুশি হলো তোদের কথা ভেবে। আমি কাকা গোঁসাইকে জিজ্ঞেস করলুম খরচ খরচার কথা। কাকা গোঁসাই বললেন, দেখ রাধারাণী যদি তোকে টেনে থাকেন খরচ ঠিক জুটে যাবে।

আমি বললুম, যাবার তো ইচ্ছে। আপনার সঙ্গে যেতে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু অতো টাকা পাবো কোথা?

—চেষ্টা কর। ঠিক জুটে যাবে। রাধারাণীকে তোর মিষ্টি গলার কেত্তন শুনিয়ে আসবি চল। সত্যি ভারি লোভ ছিল যাবার। রাধারাণীর কৃপা না হলে তো ঘটে না। ওমা, ভক্ত দিয়ে আমার বাড়িতে হাজির। বলে, চণ্ডী নাতনি আমাদের সাথি হচ্ছো তো? আমি ঠাট্টা করে বললুম, তুমি যে বড়ো নতুন বউ ছেড়ে চললে? বললে, কী করি বলো, গোঁসাই-এর কথা তো ঠেলতে পারবো না। তা ছাড়া ভাই পরকালের কথাও তো ভাবতে হবে। আমি বললুম, তা আবার হবে না। মনে পড়ল, তোর কথা। ও গেলে তুই ও দুদিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচবি। আমি ওকে খুব নাচিয়ে দিলুম। ও বললে তুমিও চলো না ভাই বোষ্টমের সেবাদাসী হয়ে। খুব আনন্দ দিতে পারবে। আর বুড়োকে একটু—হতভাগা ঢোঁক গিলে আমাকে চোখ মারলে। মনে হলো এক থাপ্পর কষে দিই। কিন্তু রাগ সামলে নিয়ে বললুম, আমায় টাকা দেবে কে ভাই? বুড়ো বললে, তুমি রাজি হলে আমি দোব। কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি দুজনকার টাকা এনে তোমার হাতে দোব তুমিই সব খরচ করবে। এ আমাদের গোপন কথা। সত্যি গেঁদাফুল আমি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলুম। পরে কেমন জেদ চেপে গেল। এ অপমানের শোধ নেবার জেদ। তোদের কথা ভাবলুম। মনে পড়ল ঐ গানটা 'সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি'। অন্তত মাস দুই তোদের কাছছাড়া করে রাখতে পারবো। ইতিমধ্যে তোরা আপনার গুছিয়ে নিবি।

কেষ্ট একমুখ হাসলো।

চণ্ডী তার গাল টিপে দিয়ে বললে, খুব খুশি।

কেষ্ট তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খেল।

চণ্ডী বললে, তোমার বরকে দিয়ে কিন্তু আমি পা টিপিয়ে নোব। বাসি কাপড় কাচিয়ে নোব। এঁটো পাত্তা মুক্ত করিয়ে নোব। আর ওরি টাকায় তীর্থ করে আসবো। হারামজাদা বলে কিনা সেবাদাসী। আমি ওর সেবাদাসী কি ও আমার সেবাদাস পরে শুনতে পাবি গাঁয়ের লোকের মুখে।

—পারবি ?

—আমার নাম চণ্ডী বোষ্টুমী। আমি ওকে চরকী নাচ নাচাবো। ওর সেবাদাসী নিয়ে বোষ্টম হবার আর ছুকরী বউ নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবার সখ মিটিয়ে দোব।

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, তুই কিন্তু ভারি রেগেছিস গেঁদাফুল। এমন রাগতে তোকে আমি কখনো দেখিনি।

—তুই আর আমায় দেখলি কবে ? এই তো কদিন গাঁয়ে এসেছিস। ফটিক বরং কিছুটা চেনে। ওর কাছে শুনিস আমার গুণের কাহিনী।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তুই ভাই হঠাৎ চললি কেন আমাদের ছেড়ে ?

—আ মলো। তোদের জন্যেই তো যাচ্ছি। তোদের পথের কাঁটা সরিয়ে নিয়ে। তোরা সুখি হবি বলে।

—আমাদের সুখের জন্য তুমি দুখ্যু পেলে আমরা সুখি হবো কেমন করে ?

চণ্ডী হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস ভঙ্গিতে বললে, আমার সুখদুঃখের কথা ভাবিস নে। আমার সুখদুঃখের কথা ভাববার মানুষ নেই রে গেঁদাফুল, এ সংসারে। নিজের সুখদুঃখের কথা নিয়ে চণ্ডী কখনো মাথা ঘামায় না।

চণ্ডীর চোখ দুটি ছলছলিয়ে এলো। কেষ্টর বুঝতে বাকি রইলো না যে তার মনে একটা ভার রয়েছে। কিন্তু কি সেটা, কিসের ভার সে আঁচ করতে পারল না। কেষ্ট নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল।

চণ্ডী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিসের ভাবনা?

কেষ্ট বললে, কি বলবো বল। আমার ভাবনা তুই ভাববি। কিন্তু তোর ভাবনার একটু ভাগও দিবিনি আমাকে?

—ইস। অভিমান?

—না। অভিমান নয়। দুঃখ্যু।

—কিসের দুঃখ্যু? শুনি।

কেষ্ট বললে, তোর কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। কিন্তু আমার কাছে তোর সবটাই ঢাকা। আমাকে কিছুই বলতে চাস না। কেন, তুই-ই জানিস।

—বলতে না পারার ও অনেক দুঃখ্যু। বেশ, কি জানতে চাস তুই বল। মনে দুঃখ্যু থাকে কেনে?

—ঠিক ঠিক জবাব দিবি তো?

—চণ্ডী মিছে কথা বলে না।

—বেশ। তুই কারুকে ভালোবাসিস না?

—নিশ্চয় বাসি।

—সে তোকে ভালোবাসে?

—তা জানি না। জানতে চাই না।

—তাকে ভালোবেসে তুই সুখি নোস?

—ভালোবেসে আমার চেয়ে কেউ সুখি নয়।

কেষ্ট খিল খিল করে হেসে উঠলো। বললে, বারে, সে তোকে ভালবাসে কিনা তাই জানিস না, তবু তুই সুখি?

চণ্ডী গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তাকে জানিয়ে, তার সঙ্গে কড়ার করে তো তাকে ভালোবাসিনি।

—লোভ নেই?

—কিসের লোভ?

—তার ভালোবাসা পাবার। তাকে পাবার?

চণ্ডী হাসতে হাসতে জবাব দিল, লোভ থাকলেও পাবার আশা নেই। আশা নেই জেনেই ভালোবেসেছি।

—আশা নেই কেন?

—নাগাল পৌঁছুবে না। হাত বাড়ালেই তো চাঁদ ছোঁয়া যায় না।

—তবে জেনেশুনে এ ভুল করলি কেন?

—মন তো আমার হাতধরা নয়। আর ভুল তো আমার মনে হয় না। ভুল হলেও তার জন্যে আমার মনে কোন দুখ্যু নেই।

—কেমন তোর মন? কি দিয়ে গড়া? আমরা তো পাগল হয়ে যেতুম।

চণ্ডী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, পাগল হতে কি তোর বাকি আছে নাকি? তোদের ভালোবাসা সত্যি বলেই আমার মনে হয়েছে। তা না হলে আমি তোদের প্রেমে দূতীগিরি করতে আসতুম না। তা ছাড়া তোকে ভুল পথ দিয়ে ভক্ত এ বাড়িতে নিয়ে এলো। তোর আসা উচিত ছিল ফটিকের হাত ধরে, এলি ভক্তর হাত ধরে।

কেষ্টর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো।

—আমার কি সাধ? যাকগে আমার কথা ছেড়ে দে। তুই নিজের কথা বল। বল ভাই।

—সব তো বললুম। আর কি বলবো ?

—কিছুই বলিস নি ? আমি তোকে তার নাম জিজ্ঞেস করবো না। আমি জানি। মেজদাকে আমি চিনি।

সাপের মতো চমকে উঠলো চণ্ডী : কে বললে ?

চণ্ডী তার চুলের মুঠি ধরে মুখ রাঙা করে বললে, ফটকে বুঝি ?

—না তুমি নিজে বলেছো।

—পোড়ারমুখি আমি তোমার কানে ধরে বলতে গেছি।

কেষ্ট চুলগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হাসিমুখে বললে, মুখে না বললেও, তোর চোখ বলেছে, তোর ভাবভঙ্গি চলাফেরা সব একসঙ্গে বলেছে। যেদিন মেজদা কোলকাতা যায়। তুই গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলি।

চণ্ডী উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন করল, তুই দেখেছিস ?

—হ্যাঁ। আমি চঁদে পুকুর থেকে আসছিলুম।

চণ্ডী মুখ বেঁকিয়ে বললে, আর তুই অমনি বুঝে ফেললি, আমি ওকে ভালোবাসি।

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, তার নামেতেই তোর মুখের চেহারাটা কি হয়েছে একবার আর্শিতে দেখনা। আমারই চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—খা না পোড়ারমুখি। কে মানা করছে—

বলতে বলতে সে গভীর স্নেহে কেষ্টকে বুকে টেনে নিয়ে তার মুখে চুম্বন এঁকে দিল।

তার চোখের কোলে অশ্রু টলমল করছে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে কিন্তু কবে, কেমন করে ওর সঙ্গে প্রথম ভালোবাসা হলো বলনা ভাই।

চণ্ডী বললে, তুই মহা ছ্যাঁচরা।

—তা হোক। তুই বল।

চণ্ডী একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকখালি করে বললে, বছর দুই আগে, পুজোর সময় এসে কদিন এখানে ছিল। ওদের দল খুব ধুমধাম করে লক্ষ্মী পুজো করবে। একা এসেছিল। বৈঠকখানায় সব হৈ হুল্লোর করতো। লক্ষ্মী ঠাকুর তৈরী হচ্ছে। পুজোর কদিন আগে হঠাৎ মেজদার কেঁপে জ্বর এলো। ম্যালেরিয়া জ্বর। হয়তো পরের দিনই ছেড়ে যাবে। চাপা দিয়ে পড়ে রইলো। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতুম, গরম চা, দুধ খাইয়ে যেতুম। পরের দিন সকালে জ্বর ছাড়লো। কিন্তু ঠিক সময়ে আগের দিনের মতো আবার জ্বর এলো। কম্প দিয়ে জ্বর। আর বমি করতে সুরু করলে। অঘোরে পড়ে রইলো। আমি আর চঁদেদের রমেশদা কাছে বসে রইলুম। সারারাত আমায় কাছ থেকে নড়তে দিলে না। ঠায় বসে রইলুম। 'চণ্ডী' 'চণ্ডী' বলে কখনো হাতদুটো চেপে ধরে। কখনো কোলের ওপর মাথা রাখে। বলে 'বাঁচবোনা চণ্ডী ভাই। আমায় কোলকাতা পাঠিয়ে দে।' যেমনি অস্থির তেমনি ভীতু। সারারাত মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। চুল টেনে দিয়েছি। ভোরের দিকে জ্বরটা কমতেই আমার গায়ে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, কিন্তু কেউ তাকে আর ধরে রাখতে পারলে না। ব্যস্ত-বাগিশ মানুষ, কুইনাইন সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চণ্ডী চুপ করলো।

—তারপর ?

—চণ্ডী বোষ্টমী মরে নতুন করে জন্মাল। পৃথিবীটা নতুন হয়ে চোখে ধরা দিল। খালি বুক ভরে গেল। বুকের তলায় আনন্দের

নূপুর বাজল। আকাশ রঙিন হয়ে উঠলো। মনে ফুল ফুটলো। বুঝতে বাকি রইল না ফাঁদে পা দিয়েছি। প্রেমের ফাঁদ।

চণ্ডী সুর করে গাইল :

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে—
গরব সব হায়, কখন্ টুটে যায়
সলিল বয়ে যায় নয়নে॥"

চণ্ডীর দুচোখ ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা নামল।

কেষ্ট অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। একটি কথাও বললে না।

ফটিক প্রথমটা হেসে উঠলো, ভক্তর তীর্থযাত্রার কথা শুনে। তারপরই কিন্তু রাগে ফুলে উঠলো। সে দাওয়ার একপাশে ধপ করে বসে উত্তেজিত স্বরে বললে, তীর্থে যাবে বই কি। হাতে এখন আণ্ডিল টাকা।

কেষ্ট ও চণ্ডীর দু'জোড়া চোখ বিস্ময়ে তার মুখের ওপর ছিটকে গেল।

ফটিক বললে, শালা জোচ্চোর কোথা থেকে কি করে টাকা এনেছে জানো ?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তারা ওর মুখের পানে চাইল।

—আমার মা'র কাছ থেকে। বলেছে ফটিকের মাঘ মাসে বিয়ে। মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। দুহাজার টাকা এনেছে বউ-এর গয়না আর বিয়ের খরচের জন্যে।

চণ্ডী আর কেষ্ট একসঙ্গে বলে উঠলো, সে কি রে ?

—তুই জানলি কেমন করে ?

ফটিক বললে, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। ঐ যে থিয়েটারে বেয়ালা বাজাতে এসেছিল ভদ্রলোক, সেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজে থেকে আলাপ করলে। ভদ্রলোক বাবুদের বাড়ির সরকার। আমাদের গাঁয়ে আসছে শুনে মা আমার খবর নিতে বলেছে। বিয়ের কথা, টাকার কথা সব বলেছে। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেলুম। কি যে বলি ভেবে পেলুম না।

কেষ্ট বললে, আমি তোকে সেদিন বলিনি।

চণ্ডী হঠাৎ হেসে কুটিকুটি।

—কি লা। অতো হাসছিস কেনে?

চণ্ডী গম্ভীর হয়ে কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলে, তোকে বিয়ে করতে ওর খরচ হয়েছে তো?

—তা হয়েছে বই কি! মাকে দিয়েছে, কানাঘুষো শুনেছি পাঁচশো টাকা। আর আমাকে দিয়েছে এই সোনার শিকলি হারটুকু, দুগাছা বাঁধানো শাঁখা আর এই কানের দুল।

আবার একটা হাসির ঢেউ তুলে চণ্ডী বললে, অন্যায় তো কিছু করেনি। মনে জানে সবই ফটিকের। ও ফটিকের বেনামদার। বেনামিতে ফটিকের জন্যে জমি কিনেছে সেবার। এবার বেনামিতে ফটিকের জন্যে বিয়ে করেছে। বউ তো আসলে ফটিকের।

—ধেৎ। তোমাকে আমি দিদি বলি না?

কেষ্টর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। তার ভাল লাগল ফটিকের এই সলজ্জ ভঙ্গিটি। সে আড়চোখে তার পানে চাইল।

চণ্ডী আবার হাসল। হাসতে হাসতে কপাল চাপড়ে বললে, অদেষ্ট ভাই রে অদেষ্ট। নইলে ভেবে দেখ মূলে সব ঠিক। তোর নাম করে, তোরি টাকা নিয়ে বউ ঘরে নিয়ে এলো, হয়তো তোরি জন্যে, কেবল উলটো পথ দিয়ে।

কেষ্ট তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে কটাক্ষ হানলো।

ফটিক বললে, বড়ো অসভ্য তুমি চণ্ডীদি।

—আমি তো চিরকেলে অসভ্য আর গাঁওয়ার। কিন্তু এ সব শুনলে মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোয়? তুই বল। তোকে শিখণ্ডী খাড়া করে কপিলা গাইকে বেশ দোহন করছে তো বুড়ো। ধড়িবাজ বলতে হবে।

—সয়তান শালা!

চণ্ডী বললে, যাক আমি এখন দিনকতক ঠগের পয়সায় একটু ধম্ম করে আসি। আমারো পোড়া কপাল, নইলে আমার কাছে তোর ঠাকুবাবা টাকা বাজায়! তুই বাজালেও বা কথা ছিল।

কেষ্ট খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ফটিক বললে, দাওনা ওকে বিনয় হাজরার মতো শায়েস্তা করে।

চণ্ডী হেসে উঠলো: তোর মনে আছে তো?

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কে? কে বিনয় হাজরা? কি হয়েছিল বলনা ফটিক।

—আমি পারবো না। চণ্ডীদিকে জিজ্ঞেস করো।

কেষ্ট সাগ্রহে তার হাতদুটো চেপে ধরে বললে, বল না ভাই গেঁদাফুল।

চণ্ডী হাসতে হাসতে বললে, আমাদেরি গাঁয়ের ছেলে বিনয় হাজরা। পাঁচটা চেঠো চ্যাংড়া ছেলে যেমন আমার পেছনে ঘোরে সেও তেমনি ঘুরতো। কলকাতায় উকিলের মুহুরী, কাঁচা পয়সা রোজগার করতো। মেজদার দল মাঝে মাঝে তার ঘাড় ভেঙ্গে খেতো। আমিও অবিশ্যি বাদ যেতুম না। একবার বাড়ি এসে সে বেজায় বাড়াবাড়ি শুরু করলে। পকেটে টাকা ফেলে আমার সামনে বাজায়। ইশারা ইঙ্গিত করে। চার আনার সাবান কিনে

টাকার কেরং নিতে ভুলে যায়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে। শিষ দিয়ে ডাকে। কতো আর বলবো।

জ্বালাতন হয়ে উঠলুম।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। দাওয়া থেকে নজরে পড়ল অন্ধকারে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে বিনয় সিগ্রেট খাচ্ছে। আমি সরে গেলুম। আবার একটু পরে দেখি সে সরে এসেছে একটা ঘুপশি ঝোঁপের আড়ালে। আমার রাগ হলো। একটা ঢিল তুলে চেঁচিয়ে বললুম, খস খস করে কীরে কেলো, কেলো আমার ছোট ভাই। শেয়াল নয় তো? বলেই হুস করে তাড়া দিয়ে ঢিলটা ছুড়ে দিলুম। "আঁক্" করে শব্দ হলো।

ভয় হলো। ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধরে ও বসে পড়েছে। মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে জামার বুকটা লাল হয়ে উঠেছে।

বাড়িতে নিয়ে গেলুম। কপালটা কেটে গেছে। চণ্ডীর হাতের ঢিল। ছেলেদের সঙ্গে বাজি রেখে বাঁ হাতে পাঠে পুকুর পার করেছি।

কি আর করি। কপালটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে কচি দুব্বো ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ব্রজবুলি শুনিয়ে দিলুম। পায়ে ধরতে বাকি রাখলে। বললে, বলিস নি ভাই কারুকে। খুব শিক্ষে দিয়েছিস।

ফটিক বললে, সেই রকম শিক্ষা দিয়ে দাও আমাদের এই বুড়োকে চণ্ডীদি!

—তাই ভাবছি। আমাকে ওর সেবাদাসী সাজাতে চায় টাকার লোভ দেখিয়ে। আমি ওর হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দোব। আমি

ওকে দিয়ে পা টেপাবো আর ব্রজবুলির দেশে গিয়ে ব্রজবুলির চোটে অস্থির করে দোব।

—তাতে হবে না চণ্ডীদি, ও শালার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। ওকে চলন্ত রেল গাড়ি থেকে ফেলে দিতে পারো, তবে আমার রাগ যায়।

চণ্ডী আর কেষ্ট একসঙ্গে হেসে উঠলো।

কেষ্ট ভুলেই গিয়েছিল যে সে ভক্তর টাকা চুরি করে ফটিককে দিয়েছে। এতোদিন ভক্তর টাকার দরকার হয়নি বলেই হয়তো এখনো সে জানতে পারেনি। হয়তো তার গুপ্ত ভাণ্ডারে সে হাত দেয়নি। কিন্তু এখন তো সে গুনে গেঁথে টাকা নিয়ে যাবে। কথাটা মনে পড়তেই কেষ্টর বুক দুর দুর করে উঠলো। সে কাঁপড়ে পড়ল।

কেষ্ট চুপিচুপি ফটিকের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। ফটিক ও প্রথমে ভড়কে গেল।

কেষ্ট বললে, এক কাজ কর না ফটিক, যে ক-খানা নোট আমরা নিয়েছি সে ক'খানা একবার কোথাও থেকে এনে ভরতি করে রেখে দেনা। তারপর ও কিছু সব্বস্ব ট্র্যাকে করে নিয়ে যাবে না। তখন আবার বের করে নিলেই চলবে।

ফটিক কি ভেবে বললে, কিন্তু কে দেবে? পান্নুদা থাকলে না হয় কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের চাষী মহলে দেবে কে?

কেষ্ট বললে, আমার এই হারটা রেখেও আনতে পারবি নে? যাবার সময় ওর মনের বিশ্বাস খোয়াতে চাই না। একবার মনে খটকা লাগলে, সব সরিয়ে রাখতে পারে।

—হুঁ! আচ্ছা দেখা যাবে। ওর জন্মে ভাবনা নেই।

ও হিসেবে বাঘ। হয়তো ওর মনেই নেই কতো রেখেছিল। আজ কথায় কথায় জিজ্ঞেস করোনা, কতো টাকা খরচ হবে। কতো টাকা আছে।

কেষ্ট হাসলো।

রাত্রে ভক্ত বললে, যাচ্ছি তো রাই, তোমার পয়েই হয়তো আমার রাধারাণী দর্শন হবে। কিন্তু অনেক টাকা খরচ।

কেষ্ট হাসতে হাসতে চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, কেন, টাকা তো তোমার ওখানে অনেক রয়েছে।

—তা আছে। পনেরো কুড়ি টাকার মতো খরচ হবে।

কেষ্ট চালাক মেয়ে। চণ্ডী বলে গেছে তার খরচ ও ভক্ত দেবে। সে ঝোঁপ বুঝে কোপ মারল। বললে, কেনে একজনের এতো খরচ হবে কেনে ?

ভক্ত থতিয়ে গেল। মনে পাপ। ঢোঁক গিলে বললে, অতো খরচ হবে না হয়তো। তবে বিদেশ বিভুঁই। সঙ্গে থাকা ভালো। শরীর গতিকের কথা কে বলতে পারে। ট্যাকে পয়সা থাকলে পরেও যত্ন করবে।

ভক্ত কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে হাসলো।

কেষ্টও মনে মনে হাসলো।

ভক্ত চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, ফটকে ঘুমিয়েছে ?

—কখন ঘুমিয়েছে। কী যে ঘুম। পড়লো তো যাঁড়ের মতো ঘুমোলো। আধেক দিন ঘুম থেকে উঠিয়ে ঐ বুড়ো খোকাকে আমায় খাওয়াতে হয়। হাড় জ্বালাতন।

পাশের ঘরে দেয়ালে কান দিয়ে ফটিক দাঁড়িয়েছিল। তার কানে গিয়ে কেষ্টর কথা গুলো পৌঁছলো।

চাপা গলায় ভক্ত বললে, একবার ওই ঢাকাটা খুলে শুনে

দেখতো কেষ্টকলি, কত্তো আছে? ইসব তো দশের নোট। তুখানা শয়ের নোট আছে।

কেষ্টর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কী সর্বনাশ! কেষ্ট কিন্তু দমলো না। সে বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বললে, এখুনি কেনে? তুমি তো এখুনি যাচ্ছো না?

—তা যাচ্ছি না। কালই তবে খানিকটা টাকা দিতে হবে। কিছু কেনাকাটি আছে। আর রেলের টিকিটের মাশুল।

আসল কথাটা চণ্ডী আগে হাতে টাকা না পেলে যাবার ব্যবস্থা করবে না। তাকে কালই একশো টাকা দিতে হবে।

তক্তাপোষের নিচে একটা তোরঙ্গ। তোরঙ্গটা একখানা পাথরের ওপর বসানো। কেষ্ট গুঁড়ি মেরে তক্তাপোষের নিচে ঢুকে তোরঙ্গটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তুহাত দিয়ে আস্তে আস্তে সরাল পাথর খানা। নিচের মাটিতে একটা পিতলের হাঁড়ি পোঁতা। মুখে একখানা পিতলের সরা চাপা। ঢাকা খুলে কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, নোট গুলো বের করে দিই না তুমি গুনে দেখো।

—না। না। তুমিই গোন। আমার গুনতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

হাসলো ভক্ত। বললে, তুমি ভাল হয়ে বসে গুনে গুনে আমায় বলো।

কেষ্ট কোলের উপর নোটগুলো বের করে গুনতে বসলো। কেষ্টর মনে হলো ফটিক তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের ও দিকে টক টক শব্দ হলো। কেষ্ট কি বুঝলো কে জানে। মুখ টিপে হাসলো।

ভক্ত উবু হয়ে বসে ডাবা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, হাঁগা, বড়ো দুখানা শ'য়ের নোট বুঝি? এই দুখানা?

কেষ্ট হাত বাড়িয়ে তাকে দেখাল।

ভক্ত বললে, হ্যাঁ গো, কেষ্টকলি।

—বেশ দেখতে তো নোট দুখানা। এ দুখানা কিন্তু ভাঙিয়ে খরচ করো না। জানো?

কেষ্টর মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভক্তর বুকে একটা খোঁচা দিল। ভক্ত হাসতে হাসতে বললে, না গো না।

শুধু ও দুখানা কেন, সবই তোমার জিম্মায় রইলো। এ সব তোমার। আমার পথখরচের টাকাটা আমি তোমার কাছে চেয়ে নিচ্ছি।

কেষ্ট কৃতজ্ঞতা ভরা নম্র দৃষ্টিতে তার পানে তাকালো। তার মুখে প্রসন্ন হাসি।

ভক্ত হাসতে হাসতে বললে, বিশ্বাস হলো না বুঝি?

—বিশ্বাস হবে না কেনে? আমার কোন দুখ্যুটা তুমি রেখেছো। চাইবার আগেই তো সব দিচ্ছো। কিন্তু সেই তো সব নয়।

—তবে?

—না। বলে কি হবে? মেয়ে মানুষের মনের কথা তুমি বুঝবে না।

—কি বলো রাই, তোমার মুখ ভার দেখলে যে আমার বুকফেটে যায়।

ছলনাময়ী কেষ্ট ঠোঁট ফুলিয়ে, বুকখালি-করা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, ছলছল চোখে ভাঙাগলায় বললে, আর আমার বুকফেটে যাবে না, একা ঘরে তোমাকে ছেড়ে এতোদিন রাত কাটাতে?

কেষ্ট লজ্জালু ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করলে।

ভক্ত কাত হয়ে গেছে। হাত থেকে বুঝি হুঁকোটা খসে পড়ল মাটিতে। তাকে যেন কেউ আচমকা লেঙ্গি মেরে ফেলে দিল।

ভক্ত হতচকিতের মত ফ্যাল ফ্যাল করে কেষ্টর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কেষ্ট সুযোগ বুঝে আরো গোটাকয়েক দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর মুখখানাকে বিরহ-কাতর করে তুললো।

—তুমি, তুমি আমায় এতো ভালোবাসো রাইমনি!

অভিমানাহত কণ্ঠে মুখে ঘুরিয়ে কেষ্ট বললে, না গো। আমি কি ভালো বাসতে জানি!

ভক্ত মত্ত হয়ে উঠেছে। কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে, তার দুই চোখে। কেষ্টর ভয় হলো, পাছে আবার মত বদলে যায়। সে মুখ তুলে মৃদু হেসে বললে, মনে করো না যেন আমি তোমার ধম্মকম্মে বাধা দিচ্ছি। তা হলে আমি পাপে ডুবে মরবো। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। তোমার পুণ্যে আমারও পুণ্য। কিন্তু পোড়া মন যে বোঝে না। তাই—

—তা আমি জানি। জানি। তুমি আমার ধম্মপত্নী। তুমি কি আমার ধম্মকাজে বাধা দিতে পারো?

ভক্ত হাঁপাচ্ছে তৃষ্ণার্ত জানোয়ারের মতো। কেষ্টকে একবার বুকের মাঝে চেপে ধরতে না পারলে যেন তার দম আটকে আসছে। সে বললে, আর শুনতে হবে না। তুমি তিরিশ খানা দশের নোট বের করে নিয়ে ওটা ঢাকা দিয়ে দাও। তারপর সময়মত তুমি গুনে গেঁতে রেখো। কেবল হুঁসিয়ার, ফটকে যেন এর গন্ধ না পায়।

—ইস! ভাবনা কি? এ-ঘরে তাকে ঢুকতেই দিই না।

কেষ্ট হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। অব্যাহতি পেল টাকা চুরির দায়

থেকে। উপরন্তু আরো দুখানা নোট চক্ষুদান দিল। সামনে আবার ধর্ম্মরাজের গাজন। ফটিকের খরচ আছে তো।

ভক্তর ভয় ছিল পাছে চণ্ডীর কথা নিয়ে কোন গোলযোগ হয়। কেষ্টর অভিমান অবহেলাকে সে ভয় করে বই কি।

কেষ্টকে বুকের কাছে পেয়ে সে গলগলিয়ে ঘেমে উঠলো। কেষ্ট নোট গুলো ভক্তর হাতে দিতে গেল, বললে, একবার গুনে দেখে নাও বাপু। আমার ভুল চুক হতেও তো পারে।

—ঠিক আছে গো ঠিক আছে। তুমি তুলে রাখো, কাল জল খাবারের বেলায় আমায় দিও। আমি দিয়ে আসবো।

কেষ্ট টাকাগুলো তোরঙ্গে তুলতে তুলতে ভক্তর পানে চোখের কোণ দিয়ে চেয়ে বললে, এই এক গাদা টাকা একা একা খরচ করে আসবে।

ভক্ত হাসতে হাসতে বললে, তোর কি তীরথো করবার বয়েস হয়েছে রে পাগলি! নইলে তো সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

কেষ্ট চোখ ঘুরিয়ে বললে, তোমারও বয়েস পার হয়ে গেছে কিনা? ভারি তো বয়েস?

কেষ্ট তার গায়ের কাছে সরে গিয়ে, বুকের দিকে মাথাটা হেলিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললে, এমন শক্ত সামর্থ দেহ। কিসের বয়েস গা? পাড়ার মাগিরা বুড়ো বুড়ো করে আমায় ঠাট্টা করে। আমার এমন রাগ হয়!

কেষ্টর চোখদুটো ছলছলে। গলাটা গদগদে। মুখখানা ভারি ভারি।

ভক্ত অধৈর্যের মত তাকে বুকে টেনে নিল। কেষ্টর গা শিস শিস করে উঠলো। পাশের ঘরে আবার ফটিক জেগে রয়েছে। ভাগ্যিস মাটির নিরেট দেয়াল ফুঁড়ে চোখের দৃষ্টি চলে না।

ভক্ত তার মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে নিশ্বাস ফেলে বললে, কষ্ট হবে। কষ্ট হবে আমার রাই কিশোরীর। জানি। কিন্তু উপায় কি বলো। রাধারাণীর কৃপা হয়েছে নইলে তিনি টানবেন কেনে? আর তোমার এ প্রেম, এ কি মানুষের প্রেম কেষ্ট। এও সেই পেমময়ী রাধারাণীর দয়া। নইলে এই এতোটুকু বুকে এতো ভালোবাসা?

ভক্ত কেষ্টর বুকের ওপর হাত রাখলো। লাঙ্গল ধরা লেঠেলের লোহার মত শক্ত হাত। কেষ্টর বুকের নিচে হাঁপ ধরলো।

কেষ্ট তার হাতটা ঠেলে দিতে দিতে বললে, তা তুমি যাও না। স্বচ্ছন্দে যাও। মনে কোন খুঁত রেখোনা। আমি বাধা দোব না। ধম্মকাজে বাধা দেওয়া মহাপাপ। আর তোমার টাকা তুমি খরচ করবে। আমার বলা অন্যায়।

—কেনে, অন্যায় কেনে? বলবে না কেনে? একশোবার বলবে। তোমার বলবার হক আছে তাই বলচো।

—তুমি সে হক মেনে নিয়েছো তাই। সবাই তো মানতে চায় না। তুমি আমায় সে জোর দিয়েছো বলেই জোর করে বলতে পারলুম। আর আমাদের মেয়েদের মন ভারি ছোট। সবেতেই কু গায়। সবেতেই ভয়।

—কিসের ভয় গো রানি?

আরেকটা ঝাঁকানি দিয়ে সে কেষ্টকে একেবারে কোলে লুফে নিল। অজগর সাপের মত নিরেট হাতের বেড় দিয়ে তার সরু লিকলিকে কোমরটা জড়িয়ে ধরলো।

রাগে ও ঘেন্নায় কেষ্টর গা জ্বলে উঠল। তবু সে ধৈর্য হারাল না। রাগকে কপট অনুরাগের রসান দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে হাসতে

হাসতে বললে, দেখ তো, দেহে রাবন রাক্ষসের মতো এখনো এতো শক্তি, আর তুমি নিজেকে বুড়ো ভাবো ?

ভক্ত হেসে গড়িয়ে পড়লো।

কেষ্ট তার ভরাট হাসির সঙ্গে মিহি হাসি মিশিয়ে দিয়ে বললে, লোকের মুয়ে আগুন। বলে কিনা তোমার বিয়ের বয়েস গেছে।

—তোমার রাগ হয় ?

—হবে না রাগ ?

কেষ্ট কালো ডাগর চোখের লম্বা পাতা গুলো গালের ওপর পাছড়াতে পাছড়াতে মধুর ভঙ্গিতে মিহিসুরে বললে, জানো মেয়েরা কি চায় ? দজ্জাল পুরুষ। মেয়েরা ভালোবাসে পুরুষের এই হস্তি মাতুনি।

একটু থেমে, একটা ঢোঁক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সে নিচু গলায় বললে, তবে তো তারা পেটে ধরবে, জোয়ান অসুরের মত ছেলে।

কেষ্ট মুখ নিচু করলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ সুরে ভক্ত বললে, কিন্তু আমাদের কি আর সে আশা আছে ?

—কেনে গো, নেই কেনে ? তুমি তা হলে নিজেকে সত্যিই বুড়ো ভাবো। আর তুমি বুঝি তাই ভেবেই নিশ্চিন্দে হয়ে দরাজ হাতে টাকা পয়সা খরচ করছো ?

—কেনে বলোতো ?

কেষ্ট বললে, আমি তো সেই কথাই বলছিলুম গো। দুজনে যখন এক হয়ে ঘরকন্না পেতেছি তখন আখের ভাবতে হবে বই কি। এ কি ছেলেখেলা ? এ বছর ভালো ধান হয়েচে বলে যে আর

বছরেও হবে এমন তো কোন কথা নেই। দেয়ার ইচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো ভেবে চলতে হবে। ধরে রাখতে হবে—মেয়ে পুরুষে যখন মিলেছি তখন আঁতে গেড়ো পড়বেই। একটি হলেই পাঁচটি হবে। আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে হবেই না বা কেনে গা? আমাদের কি বয়েস পেরিয়ে গেছে নাকি?

ভক্ত মোহাচ্ছন্নের মত হাঁ করে কেষ্টর দীপ্ত মুখপানে চেয়ে আছে।

কেষ্ট তার গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, না বাপু ও সব কথা মনের কোনে ঠাঁই দিও না। ছেলে না হলে বাড়ি মানায়? তাই যদি আশা নেই জানো তবে এ বয়েসে এ ঝঞ্ঝাট করলে কেনে? বেশ তো ছিলে একা একা। ছেলে না হলে মুয়ে আগুন দেবে কে? ছেরাদ্দ ছান্তি করবে কে? না বাপু, ও কথা মুয়ে এনো না।

—তোমার কোলে আমার ছেলে দেখলে আমার মতো কেউ সুখি হবে না কেষ্ট। কিন্তু সেদিন কি হবে?

—কেনে, হবে না গা? হবে। হবে। সেদিন শ্যাম হাড়ির মা কালির কাছে শুনিয়ে এসেছি। মা বলেছেন হবে। মায়ের পুজো মানত করে এসেছি।

—সত্যি?

ভক্ত গদগদ হয়ে প্রসন্ন হাসি হাসল। সে উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন কেষ্টর সর্বাঙ্গে চোখ বুলোতে লাগল। কী যেন জানতে চায়। জিজ্ঞেস করতে চায়।

কেষ্টর বুঝতে বাকি থাকে না কি সে জানতে চায়। সে আজ স্বৈরিণীর ভূমিকা অভিনয় করতে নেমেছে। তার মুখের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সে সলজ্জ ভঙ্গিতে মৃদু হেসে জবাব দিল, এখনো ঠিক বলা যায় না। তবে যেন কেমন কেমন মনে হচ্চে।

॥ আট ॥

রসিক গোঁসাই ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করছেন। চারখানা ছৎরি দেওয়া গরুর গাড়ি বকুল তলায় জমায়েৎ হয়েছে। যাত্রিরা এসে মহাপ্রভু তলায় জড়ো হয়েছে। পোঁটলা, পুটলি, লট-বহর গাড়িতে তোলা হয়েছে। বাকি শুধু গোঁসাইজী। গোঁসাইজী বাড়ি থেকে বেরুলেই তারা যাত্রা করবে। সন্ধ্যে নাগাদ বর্ধমান পৌঁছে, রাত্রের গাড়ি ধরবে।

যাত্রি বারোজন। আটজন নারী। চারজন পুরুষ। নারীদের মধ্যে সকলেই বিধবা এবং বয়স্থা বা আধাবয়সী। একমাত্র চণ্ডীই সধবা এবং তরুণী। শুধু তরুণী নয়। রূপসী এবং হাসিখুশি। তার রূপের আর হাসির ছটায় চারিদিক ভরে গেছে। আর সব তার পাশে মিটমিট করছে। সকলের মনে ভার। প্রিয়জন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর। একা চণ্ডী হাস্যময়ী। আনন্দ প্রতিমা। তার কোন পেছটান নেই। তার মুখে বিষাদের ছায়া নেই। পরনে একখানা সাদা লালপাড় তাঁতের শাড়ি। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। গায়ে একটা হাতকাটা সেমিজ। তাতেই যেন সে ঝলমল করছে। রূপ জ্বলে উঠেছে। মোটা করে একটা পান খেয়েছে। পাতলা ঠোঁট দুখানি পানের ছোপে আর হাসিতে আগুনে কয়লার মতো জ্বলছে।

পাড়া ভেঙ্গে পড়েছে। বকুলতলা ভরে গেছে পাড়ার ছেলে মেয়ে আর মেয়ে পুরুষে। চাবিপাড়া থেকেও সব এসেছে। কেষ্টও এসেছে।

যাত্রিরা প্রায় সকলেই আত্মীয় স্বজন বা প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলছে ছলছল চোখে আর ভাঙা গলায়।

ভক্তও কুঁড়োজালির ভেতর হাত রেখে ফটিককে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল : জমিতে যেন সার দেওয়া হয়, পাঁক দেওয়া হয়। বাড়িতে থাকবে। ঠাকুমাকে দেখবে। তার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবে ইত্যাদি।

কেষ্টর হাত ধরে চণ্ডী সেখানে এসে বললে, মরণদশা। এখনো তোমার বাড়ি ঘর আর পুঁই মাচার কথা। সেখানে গিয়েও ঐ পুঁইমাচা দেখবে। রাধারাণীর দর্শন মিলবে না।

সকলে হেসে উঠলো। বিষণ্ণ স্তিমিত মেয়ে যাত্রীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। চণ্ডী ঠিক বলেছে।

সকলের মনে হলো, চণ্ডীর মত আনন্দ করে হাসিমুখে যেতে না পারলে আনন্দময়ীর দর্শন ঘটবে না।

চণ্ডী বললে, বাড়ির কথা ভুলে, সব পেছনে ফেলে যদি যেতে পারো তবেই চলো। নইলে যাওয়া মিথ্যে। মনটাকে এখানে ফেলে রেখে শুধু দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না।

সকলে অপ্রস্তুত হয়ে চণ্ডীর পানে তাকালো। ঠিক বলেছিস মা। ঠিক বলেছিস।

দত্তদের রাজলক্ষ্মী চণ্ডীর হাত ধরে বললে, তুই আমাদের জাগিয়ে রাখিস মা। ঘুমোতে দিস না।

চণ্ডী বললে, ঘুম আসবে কেন গো পিসী। এ আনন্দের রস পেলে ঘুম দেশ ছেড়ে পালাবে। রূপ দেখে চোখের পাতা পড়বে না।

চণ্ডীর ভক্তিভেজা কণ্ঠস্বর আর মুখের জ্যোতির্ময়তা সকলকে বাণীহীন করে দিল।

কেষ্ট তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।"

গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন জ্যোতির্ময় আনন্দরসিক গোঁসাইজী। নৃত্যের ভঙ্গিতে দুহাত তুলে উঠে গেলেন মহাপ্রভুর মন্দিরে। সামনে বসে কীর্তন ধরলেন ঃ

হরি হরয়ে নমঃ। কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন—
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।

যাত্রিরা এবং আরো অনেকে তাঁর সঙ্গে দোয়ারকি করল। মেয়েদের মধ্যে একা চণ্ডী তাঁর সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে গাইলো। তার ভাব ও ভক্তি মিশ্রিত মধুর কণ্ঠস্বর গোঁসাইজীকে পর্যন্ত মুগ্ধ করলো।

কীর্তন শেষে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সকলে তাকে প্রণাম করলো। কেষ্ট দুগাছি বকুলের মালা গেঁথে এনেছিল। গোঁসাইজীকে প্রণাম করে একগাছি তাঁর পায়ের তলায় রাখলো। গোঁসাইজী স্মিতমুখে মালাটি তুলে নিয়ে গলায় পরলেন। তারপর আর একগাছি মালা নিয়ে চণ্ডীর কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে মালাটি তার খোঁপায় জড়িয়ে দিল।

চণ্ডী তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার গালে চুম্বন এঁকে দিল। কেষ্ট তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদলো।

চণ্ডী ভক্তর পানে চেয়ে বললে, তোমার বউ কাঁদছে।

—তোমাকে যে বড্ড ভালবাসে ও। কাঁদবে বই কি!

—যা, কাঁদিসনি গেঁদাফুল।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, বাড়ি গিয়ে যত পারিস হাসিস।

গোঁসাইজী বললেন, আর দেরি নয়। যাত্রা করা যাক। সকলে উঠলো।

গোঁসাইএর সঙ্গে সকলে জয় দিল:

রাধারাণী কি জয়! শ্রীধাম বৃন্দাবন কি জয়! মদনমোহন কি জয়!

মহাপ্রভু তলায় সকলে গাড়িতে উঠল ভাগাভাগি করে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। অনেকে গাড়ির পিছু পিছু চললো।

গোঁসাইজী গান ধরেছেন। সঙ্গে চণ্ডী গলা দিচ্ছে।

রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম
শ্যাম রাধে, রাধে শ্যাম।

আনন্দময় পুরুষ রসিক গোঁসাই। গানে, কীর্তনে, কথকথায় তিনি এ অঞ্চলে বহুবিশ্রুত।

নাম রসিকানন্দ। সত্যই আনন্দময় রসিক পুরুষ।

বড়বাগানে শাল বসেছে। অর্থাৎ আক থেকে গুড় তৈরি হচ্ছে। আকমাড়া কল বসেছে। আক মেড়ে রস হচ্ছে। রস ফুটিয়ে পাক করে গুড় তৈরি হচ্ছে। সারি সারি বড় বড় উনোন তৈরি হয়েছে। তার উপর বিরাট-বিরাট কড়াই বসানো। তাতে রস ফুটছে।

গ্রামের জমিতে যত আক হয়েছে সব এইখানে মেড়ে রস থেকে

গুড় তৈরি হবে। পালা করে চাষীরা দিন ভাগ করে নেয়। ছেলে মেয়ের দল শালে যায় আক আনতে। রস আনতে।

ফটিকের ক-কাঠা জমিতে আক বসানো ছিল। সেদিন তার পালা। সে অনেক বেলায় বাড়ি ফিরলো একগাছা মালা হাতে নিয়ে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, ও কিসের মালা রে ?

—বলোদিকিন্ ? জিব দিয়ে চেঁটে দেখোনা।

—দূর !

—সত্যি খেয়ে দেখোনা কী সুন্দর খেতে !

—কী বলনা ?

এক টুকরো মুখে দিয়ে কেষ্ট বললে, আলু ?

ফটিক জিজ্ঞেস করলে, খেতে ভালো নয় ? আকের রসে সেদ্ধ করা। আলুগুলোকে চাকা চাকা করে কেটে একসঙ্গে গেঁথে ফুটন্ত আকের রসে ফুটিয়ে নেওয়া। দিতে দিতেই সেদ্ধ হয়ে যায়। বেশ, না ?

—চমোৎকার !

কেষ্ট একমুঠো বের করে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

—তুই দুটো খা।

—আমি খেয়েছি গো। এটা তোমার জন্যে আনলুম।

—তা বলে আমি কি সব খাবো নাকি ? আমি কি রাক্ষস ?

—তুমি কি, তা আমি কেমন করে জানবো ?

ফটিক মুচকি হাসলো।

—তুই জানিস নি তবে কে জানে ?

মুখ ঘুরিয়ে ফটিক বললে, তোমার মালিক জানে।

—কে আমার মালিক ? মুখ ঘুরিয়ে নিলি কেন ? বলনা।

ফটিক মিটিমিটি হাসছে।

কেষ্ট বললে, আ গেল্! আবার হাসি দেখোনা। হাসছেন যেন হুঁকোর খোলে দুগ্গা নাম লিখছেন।

কেষ্ট সম্প্রতি জয়দেব অভিনয় দেখেছে। তার মনে পড়ে গেল 'বিম্লি মাসির' উক্তিটা।

ফটিক হেসে উঠলো। বললে, একেবারে হুবহু নকল করেছো তো 'পুন্দার' গলাটা।

কেষ্ট বললে, বেশ, করেছিল কিন্তু ওরা দুজনে, কিন্তু আর বিম্লি। হাসিয়ে পেট ফাটিয়ে দিয়েছে।

—যেমন মেজদা তেমনি পুন্দা।

কেষ্ট বললে, আমাকে একটা গান শিখিয়ে দিবি ফটিক ?

—কি গান ?

—ওই যে জয়দেবের সেই 'হবি কি আমার বর ?

—ওটা সেজদার গান। অঃ! কী সুন্দর গেয়েছিল ? যেমনি ভাব তেমনি সুর।

—তেমনি মানিয়েছিল।

ফটিক বললে, চণ্ডীদি ঐ 'হবি কি আমার বর' গানটা বেশ গায়।

—ওর কথা ছেড়ে দে। ও একটা পাকা গাইয়ে। সে দিন গোঁসাই ঠাকুরের গলায় গলা মিলিয়ে কি রকম গাইতে গাইতে গেল শুনলি তো ?

—সত্যি।

কেষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

কেষ্ট বললে, জানিস ফটিক, ও আমাকে মেজদার কথা সব বলেছে। আহা! কী ভালোই যে বাসে আর কি কান্নাই কাঁদলো।

কোন কথা লুকোয় নি। কবে কেমন করে ওর মনে ভালোবাসা এলো তাও বলেছে।

—সত্যি ? আমার কথা কিছু জানতে পারেনি তো ?

কেষ্ট ঘাড় নাড়লে। বললে, ও একটা উঁচুদরের মানুষ রে ফটিক। ওকে দেখলে কে বুঝবে যে ওর ওই হাসিখুশির তলায় লুকিয়ে আছে শুধু চোখের জল আর দুঃখের বন্যা। ওকে কেউ বুঝতে পারে না। ও-ও নিজেকে কারুর কাছে জানাতে চায় না।

ফটিক বললে, নিজের দুখ্যুকে ও দুখ্যু বলে গ্রাহ্য করে না।

—তা না হলে জেনে শুনে বিষ খায় ?

—বিষ কি গো, ওই ওর সুধা। বিষকে ও অমিত্যের মত চুমকে খাবে। খেয়ে হজম করবে। ও মহাদেবের মত নীলকণ্ঠ।

—আমার ভারি মন কেমন করছে। কী ভালোই যে ওকে আমি বেসেছি।

কেষ্টর চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

বছরের প্রথম কাল-বৈশাখি।

মোষের পালের মত কালো মেঘ উড়ে এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো। শাঁ শাঁ করে ধূলোবালি উড়িয়ে ঝড় উঠলো। বড় বড় তালগাছগুলো মাথা নুইয়ে দুলতে লাগলো। ঝপ ঝপ করে খসে পড়লো তালের শুকনো পাতাগুলো। মেঘ ডাকলো গুর গুর করে। অন্ধকার হয়ে এলো। এক ঝাপটা বৃষ্টিও হলো। ধূলো মরল। মাটি ভিজলো না।

কেষ্ট বাঁ-হাতে এক গোছা মেঘের মতো চুল মুঠিয়ে ধরে ডান হাতের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাইরে এসে বললে, আঃ! বাঁচা গেল। মা বসুমতী ঠাণ্ডা হলো।

ফটিক একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আকাশের পানে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, হলো আর কই। গর্জনই সার হলো। বর্ষণ হলো না। হলে তো ঘুমিয়ে বাঁচা যেতো। যে গরম পড়েছে ক'দিন।

কেষ্ট তার কাছে সরে এসে দুষ্টু হাসি হেসে বললে, আমার কাছে শুলেই পারিস। পাখা করে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ফটিক চোখ রাঙিয়ে বললে, ছিঃ। দিন দিন যেন তুমি কি হচ্ছো। তোমাকেও চণ্ডীদির হাওয়া লেগেছে। তার মতো মুখ-আলগা হয়ে দাঁড়াচ্ছো। মুখের আটক বাঁধন নেই।

কেষ্ট খিল খিল করে হাসির ঢেউ তুলে ঘরে চলে গেল। তার চুল থেকে এক ঝলক মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে এলো। ফটিকের দেওয়া সেই চামেলীর তেল মেখেছে কেষ্ট।

ফটিকের তার কাছে যাবার ইচ্ছে হোল। কিন্তু কেষ্ট চুল বাঁধে গা এলো করে। তাই সে যেতে পারলোনা।

ফটিক তামাক সেজে হুঁকো নিয়ে দাওয়ায় বসলো।

চুল বাঁধা শেষ করে কেষ্ট বাইরে এসেই ঝলসে উঠলো, দোহাই তোর ফটিক, ঐ দা-কাটা তামাকগুলো তুই খাসনে। চিমসে মরা পোড়ার গন্ধ ছাড়ে। কাছে যেতে গা ঘিন ঘিন করে।

—কে তোমায় কাছে আসতে মাথার দিব্যি দিচ্ছে।

কেষ্ট বললে, মুখে একটা চুমু খাবার ইচ্ছে হলে খেতে পাই না।

কেষ্ট দ্রুতপায়ে ঘর থেকে এক বাণ্ডিল সিগ্রেট এনে তার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললে, এই নাও। হুঁকোটা দয়া করে নামিয়ে রাখো।

ফটিক হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলে না। সে নিঃশব্দে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

কেষ্টর মুখে দুষ্টুমাখা হাসি। সেও স্থিরপলক চোখে তাকিয়ে আছে ফটিকের থতমত খাওয়া মুখের দিকে। কেষ্টর মুখের হাসিটা নতুন ধরনের। অনেকটা ঝড়ের আকাশের হাসির মতো। নির্লজ্জ আর বিশৃঙ্খল হলেও চোখকে স্বস্তি দেয়। আর শুধু তার মুখই হাসছে না। হাসছে তার সর্বাঙ্গ। সে হাসিতে অনেক সাহস। অনেক গরিমা। অনেক লাবণ্য। চোখের চাউনিও তেমনি নতুন ধরনের। নতুন মেঘের নতুন বিদ্যুতের মত তার ঝলকানি। শূন্য অথচ শুভ্র।

ফটিকের বুকের ভিতরটা উথলে উঠলো। সে তার মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারলে না।

ঘনকৃষ্ণ আয়ত চোখে কাজলের রেখা টেনে চোখ দুটোকে আরো বড়ো করেছে কেষ্ট। চুল বেঁধেছে গুছিয়ে পরিপাটি করে। ভুরুর মাঝে টিপ পোঁকা। ঝড়ো হাওয়ায় ভরা-ভরতি দেহটা যেন ঢেউয়ে উঠেছে। অগোছালো আর এলোমেলো বুকের শাড়িখানা। লজ্জার আড়াল রাখেনি।

দুজনে দুজনের পানে মুখোমুখি চেয়ে আছে। নতুন চোখে। নতুন ভঙ্গিতে। দুজনে দুজনকে দৃষ্টির কষ্টিতে ফেলে যেন যাচাই করছে।

আশ্চর্য, কেষ্টর মাঝে এতোটুকু তরলতা নেই। অস্পষ্টতা নেই। যা আছে তা দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা। তার ভঙ্গিটা এমনি গম্ভীর যে কে ভাববে সে ঠাট্টা করছে। সে ভঙ্গিটাকে আরো একটু গম্ভীর করে বুকের আঁচলটা টেনে দিতে দিতে বললে, কি

গো, একটা সিগ্রেট ধরাও। লক্ষ্মণের ফল ধরে বসে রইলে কেনে। কী দেখছ ?

—কেমন নোতুন নোতুন দেখাচ্ছে।

কেষ্ট হেসে উঠলো। ঘনকৃষ্ণ চোখে কটাক্ষ হেনে বললে, নোতুন হচ্ছি। নোতুন করে সাজছি তাই নোতুন দেখাচ্ছে। চোখে ভালো লাগছে না ?

—ভালো লাগছে বলেই তো বলছি।

হাসলো ফটিক। অভিভূতের মতো।

কেষ্ট বললে, আমাদের যদি নোতুন কিছু ঘটে তো ঘটুক না। নোতুন আলো নিয়ে যদি নোতুন দিন আসে তো আসুক না। একঘেয়ে পুরোনো খোলস আর ভালো লাগে না।

—তার মানে ?

কেষ্ট মুচকি হেসে বললে, আ গেল। নাজ নজ্জার মাথা খেয়ে মানে বোঝাতে হবে ওনাকে। ঘটে যদি একটু বুদ্ধি আছে।

আঁচল উড়িয়ে উচ্ছল পায়ে কেষ্ট চলে গেল।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শুক্লপক্ষের চাঁদ। প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। দুদিন পরে বৈশাখি পূর্ণিমা। গ্রামে ধর্মরাজের গাজন। গাছের মাথায় চাঁদ ভাসছে। মাটিতে চাঁদের আলো। খড়ের চালে চাঁদের আলো। ঘরের দাওয়ায় এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

গাঁয়ের রাত। রাত বাড়তে না বাড়তেই গাঁ নিশুতি হয়ে ওঠে। স্তব্ধতার গভীরে গা এলিয়ে দেয়। চারিদিক থমথম করে।

সাড়া শব্দ নেই। দূর বনে থেকে থেকে শেয়াল ডাকে। গাছের মাথায় পেঁচা ডাকে। বাঁশবনে বাতাস শিষ দেয়।

মাটি থেকে গরম ভাপ ওঠে। কামনার তপ্ত শ্বাসের মত। জ্যোৎস্না নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নেয় তার নিরাবরণ দেহের উত্তপ্ত স্নিগ্ধতা।.......

রাতের নির্জনতা দিনের মানুষকে অসংযত করে তোলে। তার পায়ে ভোগের নূপুর পরিয়ে দেয়। শ্রান্ত আতুর দেহ-মনকে ভোগচঞ্চল করে তোলে।

ফটিক আর কেষ্ট। দুজনে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খাচ্ছিল। একসঙ্গে একপাতে।

এও কেষ্টর নতুন সাধ।

দুজনে পাশাপাশি বসেছে। গায়ে গা দিয়ে।

পাশে একটা উঁচু পিঁড়ীর উপর একটা হারিকেন জ্বলছে। শিখাটা তার উঁচু করে দেওয়া হয়েছে।

দুজনে খেতে খেতে গল্প করছে। কেষ্ট মাঝে মাঝে মুখে তুলে ফটিককে খাইয়ে দিচ্ছে।

ফটিকের মনে ঝড় বইছে। ঝড় তুলেছে কেষ্ট। নতুন কাল-বোশেখির ঝড়ের মতই তার মন থেকে শুকনো আর জীর্ণ সংস্কারের পাতাগুলো খসিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

কেষ্ট বললে, মুখে বললেও এ তোমার মনের কথা নয়। আমাকে মিথ্যে বলোনা ফটিক।

—তুমি আমার মনের কথা তো জানো।

ফটিক মুখ তুলে তাকালো তার মুখের পানে। কেষ্ট বললে, আমি জানি। অনেক আগে থেকেই জানি তোমার মনের কথা। তুমি আমাকে চাও। আমাকে পাবার জন্যে নিজের সঙ্গে লড়াই করছো যদ্দিন আমি এখানে এসেছি।

ফটিক মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, লড়াই করছি

তোমাকে পাবার জন্যে ঠিক নয়। লোভের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।

ঠোঁট মুচড়ে হাসলো কেষ্ট। বললে, একই কথা।—

—একই কথা?

—একই-কথা। আমাকে পাবার লোভ তো আছে।

মুহূর্ত তার মুখের পানে চেয়েই ফটিক চোখ নামিয়ে নিল। মুখোমুখি তার দিকে চেয়ে থাকা দুঃসাধ্য। তার মুখখানা আগুনের মতো গনগন করছে। চোখদুটো সাপের চোখের মণির মতো অন্ধকারে চিকচিক করছে।

কেষ্ট বললে, তোকে আমি ভালোবাসি, বুঝতে পারিস তো?

—খুব পারি।

ফিক করে হেসে ফেললে ফটিক।

আশ্বাসভরা কণ্ঠে কেষ্ট বললে, আঃ! বাঁচলুম!

সঙ্গে সঙ্গে সেও হাসলো।

কেষ্ট বললে, তোকে ভালোবেসেই প্রথম মেয়ে পুরুষের ভালোবাসার মর্ম বুঝলুম। তোকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে তোর দিকে হাত বাড়ালুম। তুই আমায় ঘেন্না করিস বললি।

ফটিক অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, সে কথা ছেড়ে দাও। সে অনেক আগেকার কথা।

কেষ্ট তার কথায় কান না দিয়েই বললে, কেন ঘেন্না করিস তাও মনে মনে বুঝলুম।

জিজ্ঞাসাভরা চোখে কেষ্টর দিকে চাইলো ফটিক।

—বুড়োর সঙ্গে রাত কাটাই বলেই তোর ঘেন্না। আমারো নিজের ওপর ঘেন্না হলো। দেহটাকে অশুদ্ধ মনে হলো।

ফটিক অবাক হয়ে তার পানে তাকালো।

কেষ্ট তার পানে চেয়ে মৃদু হাসলো। বললে, সে পালা শেষ হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, হাত ধুয়ে নে।

কেষ্ট তার হাতে জল দিল।

দুজনে পান খেল একসঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে হাসলো।

ফটিক বললে, উঃ। তুমি এতো দুষ্টু আর বেপরোয়া তা আমি জানতুম না।

—দুষ্টু আমি না তুই? হাড় দুষ্টু। নিজে পাথর হয়ে বসে থেকে আমাকে দিয়ে মুখ ফুটে বলিয়ে ছাড়লি। পুরুষের কাজ মেয়েকে দিয়ে করিয়ে নিলি।

কেষ্ট দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু দিতে গেল। ফটিক দু'পা পেছিয়ে গেল, কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণে কেষ্ট তাকে টেনে নিল। তাকে সে বাধা দিতে পারল না। বাধা দিল না। সে নিঃশব্দে ধরা দিল তার বাহুবেষ্টনে। কেষ্ট চুম্বনে চুম্বনে তার মুখখানি ভরে দিল। ফটিকের মুখ থেকে চিবোনো পান বের করে নিল নিজের মুখে।

ফটিক সম্মোহিত।

বাণীহীন রুদ্ধশ্বাসে দুজনে দুজনের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফটিকের দুচোখ জলে ভরে এলো। তার রক্তহীন, ফ্যাকাসে গাল গড়িয়ে অশ্রুর ধারা নামল।

কেষ্ট মনে মনে হাসলো। মুখে বললে, আ গেল। তুই কাঁদছিস কেনে রে? তোকে কাঁদবার জন্যে কি আমি নিজেকে তোর কাছে বিলিয়ে দিচ্ছি। নিজেরা সুখি হবো বলেই না—

ফটিক বলে উঠলো, না কেষ্ট। এ আমি চাই না। এতে

আমরা কেউ সুখি হতে পারবো না। তার চেয়ে আমরা বেশ সুখেই আছি।

কেষ্ট হাসলো। আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, আচ্ছা পাগল! সুখেই আছি। কী সুখেই আছি।

—কেন, বেশ তো দু'জনে আনন্দে আছি।

কেষ্টর মুখে ফুটে উঠলো বন্য অনুরাগ। আকুলিত আসক্তি। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। সে তার একখানা হাতধরে বললে, বোস আমার কাছে।

দুজনে পা ঝুলিয়ে দাওয়ার উপর বসলো। চাঁদের আলোয়। পাশাপাশি।

কেষ্ট তার চোখে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করলে, সত্যি তুই আমায় চাস না?

—চাই। তবে এমনভাবে চাই না।

হেসে উঠলো কেষ্ট। মধুর ভঙ্গিতে তার চিবুক ধরে বললে, তবে কেমন ভাবে?

ফটিক তার মুখের পানে চাইল। তার মুখে ভয়াবহ কুহক। মুখের উপর চাঁদের আলোর কুহক। তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করল। কেষ্টও ফটিকের পানে তাকাল। ফটিকের মুখেও চাঁদের আলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, কেষ্ট হঠাৎ গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, নতুন-শেখা সাজাহানের গানটা:

"এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।"

সে হঠাৎ হেসে উঠলো। অসংলগ্ন বিজয়ের হাসি। বললে,

আমার জন্যে তুই মরতে পারিস ফটিক? আমি পারি। তোর জন্যে আমি হাসতে হাসতে মরতে পারি। নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তোর পা ধুইয়ে দিতে পারি।

ফটিক বললে, আমিও পারি।

গলায় জোর দিয়ে কেষ্ট বললে, না পারিস না। যার কলঙ্কে ভয় সে মরবার সাহস পাবে কোত্থেকে?

ফটিক হঠাৎ তার একখানা হাত চেপে ধরে ভিজে গলায় বললে, তুমি কি তবে আমার ভালোবাসাকে বিশ্বাস করো না?

—না। কেমন করে করবো? যে ভালোবাসা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে না, সে কেমন ভালোবাসা? আমি তোর সুখের জন্যে মরতে পারি। আর তুই আমার সুখকে পায়ে ঠেলছিস লোক লজ্জা আর কলঙ্কের ভয়ে?

কেষ্টর অভিমানাহত কণ্ঠস্বর, তার মরণোন্মুখ মুখের ভঙ্গি ফটিককে প্রচণ্ড আঘাত করলো। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কেষ্টর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, কেষ্ট আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমায় ভুল বুঝোনা।

কেষ্ট মৃদু হাসলো। বললে, ভুল আমি কোনদিন তোমায় বুঝিনে ফটিক। তোমার ভালবাসাকেও অবিশ্বাস করিনি। তুমিই ভুল বুঝছো। মেয়ে পুরুষের ভালোবাসার এই ধর্ম্ম। এই চিরকালের নিয়ম। এই মিলনই দুজনের ভালোবাসার বাঁধনকে শক্ত করে। চেরস্থায়ী করে।

ফটিক শুভ্রশূন্য চোখে তারপানে তাকালো।

কেষ্ট হঠাৎ তার গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, যাও। আমার কথা শোন। ঘরে যাও। আমি আসছি।

ফটিক কম্পিত পায়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে গেল।

ফটিকের শোবার ঘর।

পুরোনো ঘরের নতুন চেহারা। ঘরের ভোল বদলে গেছে। ছাঁদ বদলে গেছে। শুকনো ডালের মাথা ফুঁড়ে ফুল ফুটেছে। নতুনের দাবির চেহারা ঘরের সর্বত্র। নতুন এসে ঘরের দখল নিয়েছে। পুরোণোকে নতুন সাজ পরিয়েছে।

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় ফটিক।

গায়ে কাঁটা দেয়। বুকের ধকধকানি বেড়ে যায়। নেশার ঘোর লাগে চোখে।

ফটিকের তক্তাপোষখানা ছোট। বিছানাটা তাই মেঝেয় পাতা। দুজনের রাতের বিশ্রাম। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন। শুভ্র সুন্দর পাশাপাশি দু'টি বালিশ। নতুন বালিশ। কেষ্টর হাতের তৈরি। বাগ্‌দী মেয়েদের কাছ থেকে শিমুল তুলো সংগ্রহ করে তৈরি করা। বিছানার ওপর একখানা সবুজ রঙের ফুল তোলা সুজনি। কেষ্ট সুজনিখানা কিনেছিল গাজনের মেলায়। বালিশের কাপড় ও কিনেছিল সেই সঙ্গে। কেষ্ট কবে থেকে যে আজকের রাত্রিটির জন্যে তোড়জোড় করছিল তাই ভেবে ফটিকের মনে হাসি পায়। অথচ মুখফুটে কোনদিন কিছু তাকে বলেনি বা আভাসেও জানায়নি। মনে ছিল আশা ফটিকই তাকে বলবে। ফটিকই একদিন তাকে চাইবে।

কী সৌখিন মেয়ে। আর মনভরা কতো রঙিন আশা। যেন বাসর শয্যা রচনা করেছে।

ফটিকের মনে করুণার আমেজ জাগে। তার বুকের রক্ত চনচন করে ওঠে। একটা অজানা আনন্দবেদনার অনুভূতি তার অন্তরকে আলোড়িত করে তোলে। একটা আকুলতা, একটা অস্থির আবেগ। যার সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না।

ফটিক বিছানাটার পানে চেয়ে চেয়ে দেখল। চোখে পড়ল ছটো বালিশের মাঝখানে আবার কতকগুলো ফুল জড়ো করা। বেল, চামেলি, বকুল। ক-টা চাঁপা।

রীতিমত ফুলশয্যার ব্যাপার।

ফটিকের বুকের নিচেটা মুচড়ে ওঠে। কামনার চাপে তার শরীরটা ধনুকের মত আঁট হয়ে ওঠে। সে দাঁড়াতে পারে না। টলতে টলতে গিয়ে তক্তাপোষের উপর উঠে বসে। বিছানাটা তাকে আকুল আমন্ত্রন জানায়। বিছানাটা তাকে রহস্য করে। পরের বউয়ের সঙ্গে ফুলশয্যা। এ ব্যভিচার। এ পাপ।

ফটিকের হৃদয় জ্বলে উঠেই যেন বুকের ভেতর গলে যায়। পাশের ঘরে কেষ্ট শিকল তুলে দিচ্ছে আর আপনমনে গাইছে :

"আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।"

ভয়াতুর দৃষ্টিতে ফটিক বাইরের পানে তাকালো। বাইরের দাওয়ায় জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। রাত যতো বাড়ছে চাঁদ যেন ততই অস্থির আর তেজালো হয়ে উঠছে।

কেষ্ট উঠোনে নেমে বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিল। উঠোনের উপর দিয়ে চাঁদের আলোয় সে ভাসতে ভাসতে আসছে আর গাইছে :

"আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে—"

কেষ্ট ঘরে ঢুকলো জ্যোৎস্নার বন্যার মতো। গালভরা পান আর মুখভরা হাসি নিয়ে। ঘরে ঢুকেই সে বললে, ভারি মজা

লাগছে রে ফটিক। মনে হচ্ছে যেন আজকের পিথিবীতে আর কেউ নেই। শুধু তুই আর আমি। এই আকাশ, চাঁদ, আলো, বাতাস, গাছপালা, বাড়ি ঘর সব আমাদের জন্যে। আর আমরা দুজনে দুজনার জন্যে।

ফটিক শূন্যদৃষ্টিতে কেষ্টর মুখের পানে তাকালো। কেষ্ট এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ালো।

—কী গো বলছো না যে?

সে আরো এগিয়ে একেবারে ফটিকের বুকের কাছে গেল। মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, এখনো যে তোমার মুখ থেকে ভয়ের ভাব কাটেনি। সেই থেকে বসে কাঠ হয়ে ভাবছো। একটা সিগ্রেট পর্যন্ত খাওনি।

ফটিকের মুখে ফুটে উঠলো, মৃদু ম্লান হাসি।

কেষ্ট তার গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললে, কেমনতরো পুরুষ তুমি? এ আবার কি?

কেষ্ট তক্তাপোসে তার পাশে উঠে বসলো। হাতে ছিল পান। তার মুখে দিয়ে বললে, মন খোলসা করে হাসো। মনে কোন খটকা রেখো না। মনে খটকা জাগলেই, আমাদের ভালোবাসাকে মিথ্যে মনে হবে। আমরা মিথ্যে হয়ে যাবো। আমি মেয়ে ছেলে। তুমি আমায় ভরসা দেবে। সাহস দেবে।

ফটিক মুখ তুলে আর্তস্বরে বললে, কেষ্ট, লোকে ছিছি করবে।

কেষ্ট উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, আমাদের ভালোবাসা সে ছিছি-র মুখে পাঁশ চাপা দেব। লোকের ছিছি-র ভয়ে আমাদের ভালোবাসার গলাটিপে মারতে হবে নাকি?

ফটিক তার মুখ থেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। একটা

শিখার মত জ্বলছে সে। অপরূপ সেজেছে সে। কে বলবে গরীব চাষির ঘরের মেয়ে। চাষির বউ। পরেছে সে ফটিকের কিনে-আনা সেই শান্তিপুরের ডুরে। শাড়ির নিচে সেই সেমিজ, বডিস্। খোঁপায় জড়িয়েছে বেলফুলের মালা। দুপাশে দু থোকা রক্ত করবী। কানে দুল। গলায় চিকচিকে সোনার হার। হাতে শাঁখা আর কাচের রেশমী চুড়ি। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথির সিঁদুরটাও আজ জোড়ালো আর ঘোরালো। পায়ের পাতায় আলতা।

কেষ্টর মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে ফটিক বিস্মিত। সে কি কোন কিছু ভাবে না? কোন কিছু মানে না? ভয় নেই তার মনের ত্রিসীমানায়?

কেষ্ট বললে, না। আমি নিঃভয়, আমার ভালোবাসায় দাগ নেই বলে। ঘোলা নয় বলে। ভালোবাসা আর ঈশ্বর ছাড়া আর আমি কিছু মানি না। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে ভয় করি না। আমি বেতো করেছি, তপিস্যে করেছি, ভালোবাসার জন্যে আর তোমাকে পাবার জন্যে। আমি রক্ষোকালির আর বড়ো-মার পেসাদি সিঁদুর পরে এসেছি কপালে। আঁচলে বেঁধে এনেছি গাঁয়ের পঞ্চ দেবতার আশীর্বাদ। তাঁরা আমাদের রক্ষে করবেন। এর মাঝে পাপ নেই। অন্তর্যামী জানেন আমাদের মনের কথা।

কেষ্টর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

ফটিক আর্দ্র স্বরে ডাকল, কেষ্ট!

কেষ্ট বললে, অমনি করে ডেকে তুই আমায় নে ফটিক। তুচ্ছো নোকলজ্জার ভয়ে নিজের জীবন আমার জীবন নষ্ট করিস

না। আমার অনেক দুঃখের জীবন। অনেক দুখ্যুকষ্ট পেরিয়ে তোর দেখা পেয়েছি।

ফটিক বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে আছে।

কেষ্ট হঠাৎ হেসে উঠলো। বললে, বুড়ো জীবনে সত্যিকার এই একটা ভালো কাজ করেছে।

—কি ?

—তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে আমায় এনে দিয়েছে।

দুজনে একসঙ্গে হাসলো।

কেষ্ট বললে, নেমে এসো। তোমার মাথায় পঞ্চ দেবতার ফুল ছুঁইয়ে দিই।

ফটিক আচ্ছন্নের মতো মাটিতে নেমে দাঁড়াল। কেষ্ট তার মাথায় নির্মাল্য ছুঁইয়ে দিয়ে বললে, পেন্নাম করো। মন শুধ্যু করে। ভক্তি করে। দেবতা না রক্ষে করলে আমাদের কেউ রক্ষে করতে পারবে না।

ফটিক নিঃশব্দে করজোরে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো।

কেষ্ট এইবার গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে ফটিককে প্রণাম করলো। শুধু প্রেম নয়, ভক্তি উচ্ছ্বাসে পায়ের তলায় লুটোনো সে প্রণাম।

ফটিক তাকে বাধা দিয়ে বললে, ও কি করছো তুমি ?

কেষ্ট পা দুমড়ে মাটিতে বসে দুহাতে তার পা দুটো চেপে ধরে মাথা তুলে বললে, আমার সব্বস্ব আজ তোমাকে সঁপে দিলুম। এখন তোমার ধম্মে যা হয় তাই করো।

তার কণ্ঠে মিনতির সঙ্গে স্থির বিশ্বাসের দৃঢ়তা। তার দৃষ্টিতে গভীর প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গে অলৌকিক জয়ের দীপ্তি।

ফটিক অস্থির আবেগে নত হয়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিল। তারপর তাকে বুকের মাঝে নিস্পেষিত করে গালে মুখে চুমু খেতে খেতে অপরূপ আনন্দে গুঞ্জন তুললো, আমি চাই। আমি চাই তোমাকে কেষ্ট। বাঁচবার জন্যে তোমাকে আমি চাই।

॥ নয় ॥

বারো মাসে তেরো পার্বন। উৎসব আনন্দের ছড়াছড়ি। বছরের প্রথম দিনটি আরম্ভ হবে আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে। বছর শেষ হবে ঘটা করে উৎসবের মধ্যে দিয়ে। বাঙলার মাটিতে উৎসবের মাদকতা। আকাশে উৎসবের ঘনঘটা। বাতাসে উৎসবের মদিরতা। বাঙালী আনন্দ পিয়াসী। মন তার আনন্দ মধুর।

অন্তত সেকালে তাই ছিল। গ্রাম ছিল কৃষি-নির্ভর, গ্রামে ছিল মাঠভরা ধান। পুকুরভরা মাছ। গোয়াল ভরা গাই। অন্নের জন্য তাদের হাহাকার করতে হতো না। শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের করুণার অন্ত ছিল না। কাজেই সে কালের বাঙালীরা পেরেছিল বারো মাসে তেরো পার্বন করে, আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে।

বাঙালী শুধু আনন্দপিয়াসী নয়। বৈচিত্র্যপিয়াসী। বিচিত্র তার উৎসব আনন্দের ডালি। বিচিত্র তার আনন্দ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। তখনকার দিনে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই পূজা পার্বনের মধ্যে দিয়েই তাদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠতো এবং পালপার্বনের মধ্যে দিয়েই তারা জীবনের আনন্দ মাধুর্য উপভোগ করতো। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন ছিল ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্ম ছাড়া তাই কোন আনন্দ উৎসব ছিল না। পাল পার্বন ছিল না।

এ গ্রামের ধর্মরাজের গাজন ও এক বিচিত্র আনন্দোৎসব। শুধু বিচিত্র বললে বলা হয় না। এ এক অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য অনুষ্ঠান।

ধর্মরাজ গ্রাম্য দেবতা। বৈশাখি পূর্ণিমায় এই দেবতার পূজা উপলক্ষে হয় এই উৎসব।

যমের নাম ধর্মরাজ। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের এক নাম ধর্মরাজ। বুদ্ধের নামও ধর্মরাজ।

এ গ্রামের এই ধর্মরাজ ঠাকুর যে কে, জানা নেই। তবে মনে হয় ইনি যমরাজ।

গ্রামের প্রান্তে বাগদিপাড়ায় এঁর দেউল। বাগদি এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর পূজারী। পুরোহিত ও বাগদী। তাদেরি এই উৎসব। তবে গ্রামের প্রাচীন দেবতা হিসাবে গ্রামবাসী মাত্রেই তাঁকে ভক্তি করে। তা ছাড়া যমরাজের অমিত প্রতাপকে ভয়ে ভক্তি কে না করে।

ধর্মরাজ নাকি পাতাল নিবাসী। গ্রামের দত্ত পুকুর নাকি পাতালের সঙ্গে সংযুক্ত। দত্ত পুকুর অতল কিনা জানিনা, তবে সুগভীর এবং সুবৃহৎ নিঃসন্দেহ। সেই পুকুর দিয়ে ধর্মরাজ ঠাকুর গমনাগমন করেন, পাতাল থেকে পলাশী এবং পলাশী থেকে পাতাল। বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি এখানে শুভাগমন করেন ভক্তদের পূজা গ্রহণ করতে।

তাঁর আবির্ভাব পর্বটাই সব চেয়ে বিস্ময়কর এবং অলৌকিক। পূর্ণিমার পূর্বদিন তাঁর আবির্ভাব হয় এবং পূর্ণিমায় তাঁর পূজা হয় সমারোহে।

শিবের গাজনের মতো এখানেও সন্ন্যাসীরা ধর্মরাজের বার করে। সংযম ও শুদ্ধাচারে। মন সন্ন্যাসী বা হেড্ সন্ন্যাসী পুজোয় বসবে সন্ধ্যার পর। পূজার উপচারের মধ্যে জলপূর্ণ কোষাকুষির দিকে চেয়ে একাগ্রমনে ঠাকুরকে আহ্বান করবে মন্ত্র পাঠ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোষাকুষির জলের মধ্যে কালো

সুতোর মতো ছায়া পড়বে যখন তখন বোঝা যাবে ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে। "ঠাকুর এসেছেন" সন্ন্যাসীরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে দণ্ড পুকুরে যাবে।

সেখানে সমারোহ ব্যাপার।

চাঁদের আলোয় পুকুর পাড়ে মেলা বসেছে। পুকুরের চারিপাশ লোকে লোকারণ্য। গ্রামান্তর থেকে জনস্রোত এসেছে। গাছ ওঠা দেখতে।

সহস্র উৎসুক দৃষ্টি চন্দ্রালোকিত পুকুরের কালো স্থির জলের দিকে নিবদ্ধ।

স্থির জলে একসময় তরঙ্গ উঠলো। নদি জলের মতো তরঙ্গ। দেখা গেল কালো ছায়ার মত গাছের মাথা নৃত্যশীল জল-তরঙ্গে মাথা উঁচু করে তুলছে। দেখলেই বোঝা যাবে একটি কাষ্ঠদণ্ড জলের ভিতর লম্বভাবে দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসীরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে দণ্ডের উপর ফুলের মালা দিয়ে জল থেকে দণ্ডটি তুলে নিয়ে আসবে। বাদ্য সহকারে।

বড় নৌকোর পাল বাঁধার মাস্তুলের মতো বৃহৎ এক কাষ্ঠদণ্ড। মাথাটা ছুঁচোলো। বিশ বাইশ ফুট লম্বা। ধর্মরাজ তারি মাঝে আবির্ভূত।

ধর্মরাজ তলায় পুরোনো এক অশ্বত্থগাছের নিচে বেদীর উপর গাছের ডালে ঠেস দিয়ে সেই দণ্ডটিকে দাঁড় করানো হবে এবং তার পুজো হবে সমারোহ করে। ছাগ বলি হবে রাশি রাশি। বাচ্ছা মোষ এবং শুয়োর বলিও হয়। পশুরক্তে স্নান করানো হবে সেই কাষ্ঠদণ্ডকে।

এ উৎসবের আনন্দটা তামসিক।

গাজন উপলক্ষে বাগ্দীপাড়ায় মদ চোলাই হয় ঘরে ঘরে। মাতালের নৃত্য এবং হৈ হুল্লোড় চলে সারাদিন। সারারাত। আদিম উৎসবের মতই স্থূল।

পূজার পর সেই কাষ্ঠদণ্ড বা 'গাছটি' অন্য একটি পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং আবির্ভাবের মতই বিস্ময়কর ভাবে সেটি অন্তর্ধান হয়ে যায়।

আশ্চর্য যে বহু গ্রামবাসী এবং ভিন্ন গ্রামবাসী একজোট হয়ে এর রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হতাশ হয়েছে। রহস্য আজো রহস্যই থেকে গেছে। ভক্তরা রীতিমত গর্বভরে বুক ফুলিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করেছে।

ফটিক নিজের গ্রাম সম্বন্ধে সদাই সচেতন। গ্রামের কীর্তিকলাপ, গ্রামের পূজাপার্বন, গ্রামের থিয়েটার, গ্রামবাসীদের প্রশংসায় সে শতমুখ। এতো পাল পার্বন, এতো আনন্দ উৎসব আর কোন গ্রামে আছে? "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

ফটিক গাছ ওঠার অলৌকিক গল্প শোনায় কেষ্টকে। কেষ্ট মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার কথা গুলো ওর কানে পৌঁছোয় কিনা কে জানে। তার বড়ো বড়ো উৎসুক চোখদুটো নেচে বেড়ায় ফটিকের সর্বাঙ্গে।

ফটিক তার সঙ্গে কথা বলছে সেই তার আনন্দ। কী কথা বলছে তার জানবার দরকার কি? চাঁদ পৃথিবীর পানে চেয়ে হাসছে। আকাশ চেয়ে আছে ধরণীর পানে। সেই হাসি, সেই অনিমেষ দৃষ্টিই পৃথিবীর বুক ভরিয়ে দিয়েছে। আর কিছু সে শুনতে জানতে চায় না। ওই হাসি আর চাওয়া যেন শেষ না হয়।

কেষ্টর মনে হয় ফটিকের ও বলা যেন শেষ না হয়। সে যেন তার

চোখের আড়াল না হয়। বেশ লাগে তার গায়ের গরমে গা দিয়ে হাঁ করে তার মুখের প্পানে চেয়ে থাকতে। কী আছে ওর মুখে যে এমন চেয়ে থাকতে ভালোলাগে। বেশ কচি কচি মায়াভরা মুখখানি। চণ্ডী গাইতোঃ নয়ন না তিরপিত ভেল। সত্যই চোখের তৃষ্ণা মেটে না।

ফটিক অনর্গল বকে যায়।

কেষ্ট মনে মনে বলে, তুমি যদি জানতে, আমি তোমায় কতো ভালোবাসি! ক্লান্ত হয়ে কেষ্ট একসময় তার কোলে মাথা রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মনে আবেশের ঘোর লাগে। সে দুহাতে তার কটি বেষ্টন করে দুর্বল ও শ্রান্ত গলায় ডাকে, ফটিক! ফটিক!

ফটিক থেমে যায় মাঝপথে। অবাক হয়ে তার মুখ পানে চায়।

কেষ্ট অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, তুই আমায় ভালোবাসিস না।

ফটিক ভ্রূভঙ্গি করে হাসতে হাসতে তার গাল টিপে দেয়।

কেষ্ট বলে, কই তুই তো নিজে থেকে একবারও আমায় ভালোবেসে একটা চুমু খাস না।

—দুষ্টু!

ফটিক রাঙামুখ নত করে তার মুখে চুমু খায়।

কেষ্টর মনের দৃঢ় বিশ্বাস চুম্বনই প্রেমের একমাত্র প্রতিশ্রুতি। ভালোবাসার প্রতীক! তাই সে থাকে থাকে কাজ ফেলে ছুটে এসে ফটিককে চুম্বন করে যায়। অবশ্য সেদিনের পর থেকে।

কেষ্ট হাসতে হাসতে সোহাগের ভিজে গলায় বলে, লক্ষ্মী সোনা! কিন্তু তুমি বড়ো লাজুক। আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের?

—লজ্জা তো তুমি ভেঙ্গে দিয়েছো।

—দূর! এখনো পারিনি। তবে পারবো।

দুইবাহুর বেষ্টনে কণ্ঠমালা রচনা করে হাসতে হাসতে বলে, তুমি যদি বুঝতে আমি তোমায় কতো ভালোবাসি।

—আমি জানি কেষ্ট। জানি বলেই সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি।

—তার জন্যে মনে দুখ্যু আছে নাকি?

—না গো, না। আর কোন দুখ্যু নেই। আমি মন ঠিক করেছি। তোমার ভালোবাসাই এখন জীবনে সব চেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তার জন্যে যদি তোমার হাত ধরে গাছ তলায় দাঁড়াতে হয় তাতেও আমার দুখ্যু নেই।

ফটিকের ভালোবাসার আন্তরিকতা কেষ্টকে পরম আশ্বাস দিল। তার মুখখানি আনন্দের বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ফটিক বললে, আমাদের ভালবাসা সত্যি হলে কেষ্ট, কোন দুখ্যুকষ্টই আমাদের পথ আগলে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা কাটিয়ে উঠবোই।

—নিশ্চয়।

চালের বাতায় একটা টিকটিকি শব্দ করে উঠল। কেষ্ট আঙ্‌লে টোকা দিয়ে বললে, সত্যি। সত্যি। তিন সত্যি। মা রক্ষোকালি, বাবা বুড়োশিব আমায় অভয় দিয়েছেন। তুমি কিছু ভেবো না। ঠাকুর মুখতুলে চাইবেন।

ফটিক অবশ, আচ্ছন্ন গলায় জিজ্ঞেস করলে, পারবে না কেষ্ট, সব দুখ্যু কষ্টকে ভালোবাসা দিয়ে ঢেউয়ে দিতে?

কেষ্ট অকম্পিত স্বরে গলায় জোর দিয়ে বললে, আমি তোমার জন্যে মরতে পারবো। ভালোবাসার জন্যে মরণ। সে তো সুখের মরণ। "সে মরণ স্বরগ সমান"।

ফটিক হাসতে হাসতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। কেষ্ট তার

বুকের মাঝে মুখ রেখে মধুর কণ্ঠে ফিসফিস করে বললে, আর তো আমার চাইবার কিছু নেই।

ফটিক হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, এখন বুঝি আমার পালা?

কেষ্ট সরম রাঙা মুখে মধুর তির্যক ভঙ্গিতে তার পানে চাইলো নিঃশব্দে।

ফটিকের মনে হয় রাতারাতি কেষ্ট যেন অনেক বদলে গেলো। সে যেন অনেক ধীর, অনেক ভদ্র, অনেক শান্ত আর অনেক নম্র। অধীরতা নেই তার মনের কোন প্রান্তে। যা আছে তা মদিরতা।

সে শুধু ডাগর চোখ মেলে নিমেষহীন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে দেখে আর আপনমনে হাসে। কী দেখে সেই জানে। অদ্ভুত অপূর্ব সে দৃষ্টি। আর সে ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায়। অঙ্গ অবশ হয়ে আসে।

এক সময় কেষ্ট ফটিককে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ফটিক, গেঁদাফুলের এই মেজদাকে ভালোবাসা, এ কেমনতরো ভালোবাসা? এ ভালোবাসার কোন মানে বুঝতে পারি না। অজান্তে ভালোবাসা। যাকে ভালোবাসি, তার অজান্তে তাকে ভালোবাসা, এমন কোন ভালোবাসার কথা নিদেনে আছে নাকি?

ফটিক হেসে ওঠে। বলে, নিদেন তো আমায় জানা নেই। তবে নাটকে নভেলে ও রকম ভালবাসার কথা আছে শুনেছি। ও একটা উঁচুদরের ভালোবাসা। অনেকটা পাথরের ঠাকুরকে ভালোবাসার মতো। মীরাবাঈ, মীরাবাঈ-এর গান শুনেছো তো? "মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর"। সেই মীরাবাঈ ছিল রাজার

রাণী। রাজাকে ছেড়ে, ঐশ্বর্য ছেড়ে পাথরের গিরিধারীকে ভালোবাসলো। গিরিধারীকে নাগর ভাবলো। মনপ্রাণ ঢেলে তার সেবা করলো, পূজো করলো, আদর যত্ন করলো। স্বামীর মতো রসের সম্বন্ধ পাতালো। সে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য ভালোবাসা। তার জন্যেও অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তাঁকে।

কেষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেঃ সে তো ভগবানের জন্যে সন্ন্যাসিনী হবার মতো। পুণ্যের লোভে।

—কিসের লোভে, কিসের আশায় জানি না। বুঝতেও পারি না। তবে এ এক ধরনের ভালোবাসা। শুনেছি এমন ভালোবাসাও আছে। মনে হয় চণ্ডীদির ভালোবাসা অনেকটা সেই ধরনের। প্রায় কাছাকাছি। মেজদাকে লুকিয়ে, না জানিয়ে তাকে ভালোবাসে। তার সেবাযত্ন করে। তাতেই সে খুশি।

—খুশি কখনো হতে পারে? চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বুকের মাঝে তুঁযের আগুন। খুব চাপা শক্ত মেয়ে, তাই।

—সেই তো কথা। চোখের ভালো লাগা। সেই ভালো-লাগা টুকুই তার সম্বল। চাওয়া পাওয়ার আর কোন কথা নেই।

কেষ্ট ভাবে। শূন্য চোখে ফটিকের পানে চেয়ে বলে, আসলে দুখ্যু যন্ত্রণাটাই ভালোবাসার আনন্দ।

ফটিক তার গায়ে ঠেলা দিয়ে রহস্য করে হাসতে হাসতে বলে, আনন্দ বৈকি! দাঁড়াও। ঠেলা বুঝবে। লোক জানাজানি হোক। বুড়ো আসুক ঘরে ফিরে। তখন বুঝবে কতো ধানে কতো চাল।

কেষ্ট হাসতে হাসতে তার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে, তখন তোর হাত ধরে বিবাগী হয়ে যাবো। বোষ্টমের মেয়ে রসকলি কেটে, খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে আনবো। তুই পাশে থাকলে আমি যমকেও ভয় করি না।

ফটিক তার গাল টিপে দিয়ে বলে, এমন রসের বোষ্টমীকে অনেকেই ভিক্ষে দেকে।

—দেবেই তো। আর তুইও তো খোল বাজাতে পারিস।

ফটিক মাথা তুলে গম্ভীর পৌরুষ কণ্ঠে বললে, অনেক কিছু পারি কেষ্ট, শুধু খোল বাজানো কেন? পুরুষ মানুষ। একটা মেয়েকে আদর করে যে-বুকে তুলে নিয়েছি সে-বুকে অসুরের শক্তি আছে। আর যে-হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছি সে-হাতে আছে বজ্রের বল। চাষার ছেলে। মাটি কোপাতে পারি। অঝোর জলে ভিজে ধান রুইতে পারি। বীজ ভাঙতে পারি। লোকের ঘরে কিষাণ হয়েও দুটো পেট অনায়াসে চালাতে পারবো।

কেষ্ট সপ্রেমে তার বলিষ্ঠ হাতদুটো চেপে ধরে আর্দ্রকণ্ঠে বলে, আমি তা জানি গো জানি।

কেষ্টর দুচোখ জলে ভরে আসে।

ফটিক আবেগে বলে, শুধু পারবো না কি জানো, কেষ্ট? পারবো না শুধু গাঁয়ে থাকতে।

কেষ্ট অগাধ অসহায় চোখে তার মুখের পানে চায়। সে জানে ফটিক তার গাঁ-কে কত ভালোবাসে।

কেষ্টর ব্যথিত অশ্রুভেজা মুখের পানে চেয়ে ফটিকের বুকটা মুচড়ে ওঠে। সে আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলে, আমরা দুজনে কোলকাতা চলে যাবো। পানুদা বলেছে, আমায় চাকরি করে দেবে। কলকাতার বড়লোক বেনেরা সব ওদের যজমান।

কেষ্ট মুখ নিচু করে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করলে, পানুদাকে কিছু বলোনি তো?

ফটিক হাসলে। বললে, মুখ ফুটে না বললেও ও আন্দাজ করে নিয়েছে।

—না। না। কিচ্ছু বলবে না। তুই চলবি আমার সাথে ঘরকে চলো। ঠাকুমা ডাকছে।

কালো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো।

ফটিক কখনো সখোনো মদ খায়। পালে পব্বনে। কেষ্ট কখনো দেখেনি। কেষ্ট ছফফট করতে লাগল।

—আবগাড়ি পুলিশ। চোলাই মদ ধরেছে। বাগ্দীপাড়ায় ঘর ঘর তল্লাস করছে। দশ বারো জনকে ধরেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে সব বর্ধমানে চালান দিচ্ছে।

জড়িত কণ্ঠে আরেকজন বলছে, বচ্ছুরকার দিন। শালারা কোথকে এসে আমোদ মাটি করে দিলে।

কেষ্টর কানে এলো কথাগুলো। পাড়ার নগেন আর কোটালদের গৌর দুজনে বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে। দুজনেই মদ খেয়েছে।

কেষ্টর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার শরীর অবশ হয়ে এলো।

ফটিকের কোন ফেঁসাদ ঘটলো না তো?

কালোর দেখা নেই।

সূর্য মাঝ-আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি করছে।

ধর্ম্মরাজ তলায় বলির বাজনা বাজছে।

কেষ্টর পা মাটিতে বসে গেছে। সে দরজার বাজু ধরে পথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেলেনী কুসমী আসছে। হাতে সেই মাছের ফলুই। পাছাপাড় শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তোলা। মুখে হাসি।

কাছে এসে চোখ ঠেরে একগাল হেসে বললে, কি গো পথচেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কার জন্যে? আমার মাছের জন্যে নাকি? রাঁধো নি?

কেষ্ট উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁলা, তোদের পাড়ায় নাকি বর্ধমান থেকে আব্‌গাড়ি পুলিশ এসেছে মদ ধরতে ?

—কই শুনিনি তো! আমরা তো ঠাকুরপুকুরে মাছ ধরছিলুম। পানু বাবু এসেছে। ফটিকদা অনেক করে বলেছিল তাই মাছ কটা দিতে এলুম।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, সে গেল কমনে ?

কেষ্টর ব্যাকুলতা ভরা আর্দ্র কণ্ঠস্বর কুসমীকে চকিত করে তুললো। সে বাঁকা চোখে দুষ্ট হাসি হেসে বললে, ওঃ! ফটিকদার জন্যে ? তাই বলো।

—তোমার কানে ধরে সব বলতে হবে নাকি ? আ গেল! সে কোথায় তাই বলনা!

—খিল খিল করে হাসল কুসমী। বললে, খানিক আগে তো পানুদার সঙ্গে ঠাকুর পুকুরের পাড়ে দেখেছিলুম। তারপর কম্‌নে গেল জানবো কেমনে ? তোমার কাছেই তো থাকবার কথা। নেই কেনে ?

চোখে ঝলকানি দিয়ে বললে, চলো। চলো। ঘরকে চলো। মাছগুলো তুলবে চলো।

কেষ্ট যেতে যেতে বললে, পুলিশ এসেছে শুনেই মনটায় ভয় হয়েছে। নইলে আর কি ? আমি কি তাকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখবো না সে থাকবে ? সারাদিনই তো বাইরে আছে।

কুসমী কটাক্ষ হেনে ঝলসে উঠলো, পুলিশ তো মদ ধরতে এসেছে গো। তারা তো তোমার ফটিক ধরতে আসেনি ?

—আ মলো! হ্যাঙ্গাম হুজ্জুতে পড়তে কতোক্ষণ ?

—না গো না। সে হ্যাঙ্গাম হুজ্জুতে ছেলে নয়। এখুনি আসবে। তুমি মাছ ভাজো তার লেগে।

দাওয়ায় বসে কুসমী বললে, একটা পান দাও।

কেষ্ট পান সাজতে বসলো।

কুসমীর ডাগর চোখদুটো কেষ্টর সর্বাঙ্গে নেচে বেড়াতে লাগল। কেষ্টর ফুলন্ত স্বাস্থ্য, তার চিকণ দেহের বর্ণ সুষমা কুসমীর চোখ জুড়িয়ে দিল। তার বসবার ভঙ্গিতে যেন অনেক গরিমা। তার চকিত চাউনিতে অনেক অন্বেষণ। সে যেন ছায়ায় শীতল। রহস্যে রঙিন।

সত্যই সে এই কটি দিনে যেন অনেক বদলে গেছে। অনেক সভ্য ও ভব্য হয়ে উঠেছে। অনেক কম্র ও নম্র হয়েছে। সমর্পণের আনন্দে ও গৌরবে সে যেন ভরে উঠেছে। ডুবে গেছে একটি প্রচ্ছন্ন আবেশের নিবিড় নিভৃতিতে।

কুসমী কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যা করলো।

খুশিতে উপচে উঠে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে, কি গো, শুভো খবরটা মুখ ফুটে আমাদের জানাবে না?

চমকে উঠলো কেষ্ট: কী শুভো খবর লা?

কুটিল হাসিতে মুখ ভরে কুসমী বললে, কাপড় ঢাকা দিয়ে কি আর কুসমীর চোখ এড়াতে পারবে?

—কী লা? আ মলো! কিসের এতো হাসি?

চাপা গলায় কুসমী জিজ্ঞেস করলে, ক-মাস?

—মরণ দশা! তোর চোখে আগুন লেগেছে।

পানটা হাতে নিয়ে কুসমী সংশয় বিচলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, সত্যি নয়? মাথা খাও আমাকে লুকিয়ো না।

—দূর! দূর!

সবেগে ঘাড় নাড়লো কেষ্ট।

কুসমী অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললে, আমার চোখ তো ভুল

করে না। চেহারাটা কিন্তু হয়েছে মাইরি ঠিক গাভিন গাই-এর মতো।

কেষ্ট হেসে কুটি কুটি।

পানটা গালে পুরে দিয়ে একটু পরে কুসমী বললে, আজ ধরাধরির দিন দেখছি। আমি মাছ ধরে আনলুম। পুলিশ মদ ধরেছে। আর এক মজার ধরা পড়েছে গাঁয়ে।

—সে আবার কি?

কুসমী পানঠোসা গালে চোখ ঘুরিয়ে বললে, শুধু পুলিশের খবরই কানে এসেছে। গাঁয়ের সব চেয়ে মজার খপরটা শোনোনি? গাঁ যে তোলপাড় হয়ে গেল।

—আমার এখানে কে-বা আসে, কে-বা বলছে? কী এমন মজার খবরটা তাই শুনি। কিন্তু ফটিক তো এখনো এলো না।

কুসমী হাসির ঢেউ তুলে বললে, আমার সঙ্গে চলো। আগে তোমার ফটিককে খুঁজে আনি। ঐ নাও, তোমার ফটিক আসছে। অনেকদিন বাঁচবি তুই রে ফটিকদা।

কেলোর সঙ্গে ফটিক এসে দাওয়ায় উঠলো। কেষ্টর পানে চেয়ে হাসতে হাসতে ফটিক বললে, পেয়াদা পাঠিয়েছিলে কেনে?

কেষ্ট চোখের ইঙ্গিতে তাকে কী বললে সেই জানে। কুসমী মুখ ভেংচে পানের রসে ভেজা রাঙা ঠোঁট উলটে বললে, কেনে? তা তুই কি বুঝবি? আমাদের মতো মেয়ে হলে বুঝতিস।

—তুষ্টুমী করিসনে কুসমী! কালো তুই যা বিকেলে আসিস।

ফটিকের গামছায় বাঁধা একরাশ হাটবাজার। কেষ্ট জিজ্ঞেস, করলে, এ সব কি?

—হাট করতে গিয়েছিলুম কুড়মুনে। [illegible] পাঁ[illegible] [illegible]
খেয়ে যে মুখ পচে গেল। আর ঠোঙ্গা[illegible] [illegible] চ[illegible]।
কোলকাতা থেকে পান্নুদা এনেছে।

ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে কু[illegible] [illegible]
এমন সোণার চাঁদ ঘর-গেরোস্ত ছেলে আর [illegible]
খেয়ে পুলিশের হাতে পড়ল।

—তুমি বুঝি তাই ভেবেছিলে। আ[illegible] [illegible] [illegible]
পাড়ায় হানা দিয়েছে শুনলুম।

—তোর ঠানদির যদি আইঢাই দেখতি[illegible], সে কি
বলবো। শিটকে মিটকে কাঠ হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে
চাতকের মতো ফটিক ফটিক বলে হাঁকছিল। আমি তো ভেতরে
নিয়ে এলুম।

—সে কি? সত্যি?

ফটিক কেষ্টর মুখের পানে তাকাল।

সরম রাঙা মুখে কেষ্ট বললে, তা পুলিশ হেঙ্গামার কথা শুনলে
ভয় হবে না?

—তোমার ভয় হবে কেনে? আচ্ছা মুস্কিল তো?

আশ্বাস ভরা চোখে ফটিক হাসল।

চোখ উলটে ঠোঁট বেঁকিয়ে কুসমী বললে, ধরবে না? বেশ
করেছে ধরেছে। গাঁয়ে যেন মদের ভাঁটি খুলে দিয়েছে।
মরদ মিনষেগুলো সব মদ খেয়ে ষাঁড়ের মতো মাতামাতি
করছে।

কেষ্ট হাসতে হাসতে কুসমীকে বললে, তুই থাম। কী তোর
মজার খবর বললিনি তো?

ফটিক তাদের মুখপানে তাকাল উৎসুক চোখে।

কুসমী বললে, ঐ যে রে ফটিকদা, বলনা তুই ঐ ঢেমনি রাখালির কথা। ওদের হলো কি ?

ফটিক সলজ্জ ভঙ্গিতে বললে, তুই বোলগে যা, আমি জানি না।

ফটিক উঠে গেল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, কী রে কুসমী। বলনা।

কুসমী গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বললে, হৈ, ও পাড়ার বেনেদের রাখালি, বড়বাগানের পেলা কোটালের সঙ্গে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ঢেমনি মাগি বিধবা। তিন ছেলের মা। কোটালদের ঐ ছেলের বয়সী ছোঁড়াটার সঙ্গে নষ্ট। মাগির কাছে আসতো যেতো। পাড়ার লোকজন বিশেষ করে ছোঁড়ার দল পেলাকে শাসিয়ে সাবধান করে দিল। মাগি পাড়ার লোকদের সঙ্গে গলা ফেঁড়ে কোঁদল করতে সুরু করলে। ছোঁড়ারা সব জোট বেঁধে মাগির পেছনে লাগল। তক্কে তক্কে ঘুরতে লাগল ওদের একসঙ্গে ধরবার জন্যে। কাল যেমন মাগিতে ছোঁড়াতে ঘরে সেঁধিয়েছে অমনি গিয়ে বাইরে থেকে ঘরে শেকল তুলে দিয়ে নাচতে সুরু করেছে ছোঁড়ার দল। তাদের নাচন কোঁদনে পাড়ার লোক জড়ো হলো। হৈ হৈ কাণ্ড।

কেষ্ট মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, সত্যি ?

কুসমী হেসে গড়িয়ে পড়লঃ ফটিকদা তো সব জানে। শিবতলায় আজ তাদের বিচার হলো।

—কী বিচার হলো লা ?

—বারোয়ারীতে জরিমানা। আর মাগিতো হার বেহায়া। পষ্টাপষ্টি অতো লোকের সামনে বলে কিনা পেলা কোটালের সঙ্গে বড় বাগানে গিয়ে সে ঘর পাতবে।

কেষ্ট মুখটিপে হাসল। জিজ্ঞেস করলে, তা গাঁয়ের লোকে কি বললে?

—আর কি বলবে বলো। দু'কান কাটা মাগি।

কুসমী চলে গেলে কেষ্ট রাঙামুখে হাসতে হাসতে ফটিককে বললে, তা হ্যাঁগা, আমাদের ও কি বড়বাগানে যেতে হবে নাকি?

ফটিক সশব্দে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টও হাসল। হাসি থামিয়ে ফটিক বললে, দরকার হলে যেতে হবে। কেন, পারবে না থাকতে?

তেরছা চোখে ঝিলিক দিয়ে কেষ্ট বললে, যেখানে তুমি রাখবে, সেইখানেই থাকতে পারবো। শুধু তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

—সে তো আমিও পারবো না রে পাগলি! কিন্তু তাই বলে তো তোমাকে ধূলো কাদা মাখাতে পারবো না। তার আগে—

ফটিক তার মুখপানে চেয়ে চুপ করল।

—তার আগে?

কেষ্ট প্রশ্নভরা চোখে তারপানে তাকাল।

ফটিক হঠাৎ তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললে, সে কথা ভাববার এখনো সময় আসেনি গো কেষ্টকলি। বর্ষা নামতে এখনো দেরি আছে। ঘর ছাইবো বর্ষা নামবার আগে। আমি চালে উঠবো, তুমি নিচে থেকে খড়ের আটি তুলে দেবে। পারবে তো?

কেষ্ট তার বুকে মাথা রেখে নিঃশব্দে তার পানে চেয়ে হাসল।

ফটিক তার গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে দীপ্ত মুখে দৃপ্তস্বরে বললে, এখন আমাদের ভরা বসন্ত। এখন আর অন্য কোন ভাবনা নয়।

ছুজনে ছুজনকে ভাববো। ছুজনে ছুজনের মাঝে ডুবে থাকবো। প্রাণভরে হেসে নাও যে কদিন পারো—

—যে ক'দিন বলছো কেন গো। আমরা সারাজীবন হাসবো। সুখেও হাসবো ছুঃখেও হাসবো।

আনন্দের আভায় কেষ্টর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার চোখছুটি চকচক করতে লাগল।

ফটিক বললে, যাও, ভালো করে রাঁধগে। আমি চান করে আসি।

—আবার যেন দেরি করোনা।

ফটিক সরে এসে আবার তার কাছে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে বললে, তোমার ভয় হয়েছিল আমি মদ খেয়েছি?

কেষ্ট মুহূর্ত তার মুখের পানে চোখ তুলে চেয়েই অপরাধির ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বললে, রাগ করোনা। আমার ভুল হয়েছে।

ফটিক হেসে ফেললে তার ভঙ্গি দেখে। হাসতে হাসতে বললে, ভুল কেন হবে। আমি তো সাধু নই। মদ যে না খেয়েছি তাও নয়। তবে এখন আর খাবার দরকার নেই। দিনরাত তো মাতাল হয়ে আছি। এ নেশার কাছে মদের নেশা?

—ভারি ছুষ্টু!

চোখে চোখ রেখে ছুজনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

কেষ্ট বললে, আচ্ছা, তোমার এতো কথা, এতো ভাব এদ্দিন কি করে চেপে রেখেছিলে বলোতো?

ফটিক হাসতে হাসতে জবাব দিল, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছিলুম না বলে।

—আ গেল! আমাকে বুঝতে আবার এতো দেরি লাগে নাকি?

—লাগে বইকি। শুধু পরের মেয়ে হলে বুঝতে দেরি লাগতো না। তুমি যে পরের মেয়ে আবার পরের বউ।

কেষ্ট হেসে গড়িয়ে পড়ল। বললে, হাড় বজ্জাৎ তুমি। আমি ভাবতুম, লাজুক, মিনমিনে। কতো ভালো মানুষটি। কিছু জানে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কেষ্ট ঘরে এসে দেখলে ফটিক চিৎ হয়ে চালের পানে চেয়ে শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে। এমনি মগ্ন যে কেষ্টর উপস্থিতির শব্দ পেলে না।

কেষ্ট নিঃশব্দে তার পাশে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, চালের পানে চেয়ে কি ভাবছো গো? চাল ছাইবার সময় তো এখনো হয়নি?

ফটিক মৃদু হেসে তার মুখের পানে চাইল। তারপর একখানি হাত তার নিজের বুকের উপর তুলে নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে বললে, হ্যাঁ কেষ্ট, এ সব সত্যিতো?

—কি গো?

—এই আমি, তুমি। আমাদের দুজনের এতো ভাব, এই ঘর সংসার, তোমার এই আদর যত্ন, এ সব সত্যি না ভানুমতীর খেল্?

কেষ্ট পান চিবোতে চিবোতে ফিক করে হাসল। ফটিক গম্ভীরভাব মাথা নেড়ে বললে, হাসবার কথা নয় কেষ্ট। মাথা ঠাণ্ডা কোরে ভাববার কথা। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে এ সত্যি।

—তবে কি মিথ্যে?

তীর্যক ভঙ্গিতে কেষ্ট তারপানে চাইল।

—মিথ্যে কেন হবে? নিশি পাওয়া মানুষও চলে। চলাটা

তার মিথ্যে নয়। আবার চলাটা তার সত্যিও নয়। একটা ঘোর তাকে চলায়। স্বপ্নের কিংবা ঘুমের ঘোর। ঘুমুতে ঘুমুতে দাঁড়িয়ে অনেকে পাশ ফেরে। সেও ঘোর করায়।

কেষ্ট বললে, তোমার কি মনে হচ্ছে আমরাও যা কিছু করছি তেমনি একটা ঘোরে?

ফটিক বললে, তোমারো তাই মনে হচ্ছে তো? হবেই। আমাদের যে একমন, এক প্রাণ।

কেষ্ট মুখ ভার করে বললে, আমার কিছু মনে হয়নি। আমার মন তোমার মতো পলকা নয়। আমার মনে হচ্ছে এইটেই সত্যি আর আগে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব মিথ্যে।

ফটিক থতমত খেয়ে গেল কেষ্টর মুখের ভাব দেখে। তার মুখের আলো নিভে গেছে।

ফটিক মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে, তুমি রাগ করছো কেষ্ট?

—করবো না? দিবারাত্তির ঐ সব কথা তোমার মনে কেন উঁকি মারে বলোতো? নিজেই বলছো এখনো ওসব ভাববার সময় হয়নি। তবে কেন আবার ও কথা ভাবো?

—ফটিক তার হাতদুটি নিজের বুকের উপর চেপে ধরে চুপ করে থাকে।

কেষ্ট আশ্বাসভরা কণ্ঠে বললে, এই আমাদের সত্যিকারের জীবন। একে মিথ্যে করতে কেউ পারবে না ফটিক। কেউ পারবে না আমাদের আলাদা করতে।

—এতো সুখ, এতো আনন্দ—আমি যে কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না।

কেষ্ট তার কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে শূন্য দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইল।

ফটিক অতল নিরাশার কণ্ঠে বললে, তোমাকে পাওয়া আমার ভাগ্য। কিন্তু সে ভাগ্যকে আমি কারুকে দেখাতে পারবো না। তোমাকে আমার বলে কারুর কাছে জাহির করতে পারবো না। চোরাই মালের মতো তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

তার ব্যথিত মুখের পানে চেয়ে কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলে। তাকে নিয়ে যে ওর কতো সাধ, কতো আহ্লাদ এই কটি দিনেই কেষ্ট তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছে। কিন্তু উপায় কি ?

সে নিঃশব্দে তার বুকের উপর মাথা রাখলো।

॥ দশ ॥

দিনের পর দিন কেটে যায়। মাস কেটে যায় স্বপ্নের আবেশে। আকাশ থেকে মুছে যায় বৈশাখের বৈরাগী দৃষ্টি। বাতাস থেকে উবে যায় খর জ্যৈষ্ঠের রুদ্ধ হতাশ্বাস। মাটি থেকে নিঃশেষ হয়ে যায় গ্রীষ্মের রুক্ষ কাঠিণ্য। আষাঢ়ের মেঘকজ্জল দিনের স্নিগ্ধ ছায়া নামে ঘনশ্যাম তরুশ্রেণীর বুকে। বর্ষণমুখর রাত্রের ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। যৌবনের বন্যতার মতো। গাছের মাথায় বৃষ্টির ঝুপঝাপ শব্দ হয়। খড়ের চালেও বৃষ্টির একটানা শব্দ। একটা মোহময় অজানা রাগিণীর ঝঙ্কারের মতো।

এমনি নিভৃত রাতের অনুকুল পরিবেশে দুটি তরুণ তরুণীর সন্নিকট সান্নিধ্য তাদের নিকটতর করে তোলে। তাদের রক্তে দোলা জাগায়। মনে ফুল ফোটায়!

ফটিক ও কেষ্টর মনের বিস্ময় বাড়ে। দিনের পর দিন দুজনে দুজনের পানে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়। গভীর হয়ে ওঠে তাদের প্রেম। নব বিবাহিত তরুণ দম্পতীর মতই তাদের প্রেমের আকুলতা। তাদের প্রেমের আন্তরিকতা। তাদের আনুগত্যের নিষ্ঠা।

তাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা দু'য়ে মিলে এক হয়ে গেছে।

কেষ্টর মন থেকে ভক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভক্ত তার কাছে কোনদিন সত্য হয়ে দেখা দেয়নি। তবুও সে একটা নিরবলম্ব ছায়ার মতো তার মনের একটা রিক্ত শাখা ধরে দুলতো। সে

ছায়াটুকু পর্যন্ত ফটিক সরিয়ে দিয়েছে। আশ্রয় শাখাটা নির্মূল করে দিয়েছে।

আশ্চর্য তাদের প্রণয়। তাদের চেতনা থেকে যেন মুছেই গেছে ভক্তর অস্তিত্ব। কেষ্টর উপর তার অবিচ্যুত অধিকার।

ভক্ত যে আবার ফিরে আসবে সে কথা যেন তারা ভুলেই গেছে। শুধু ফিরে আসবে নয়, ফিরে এসে কেষ্টকে দখল করবে। ফটিক আর তার মাঝে নিরেট নিশ্ছিদ্র দেয়াল তুলে দাঁড়াবে।

প্রণয় যখন নিরাপদ তখন বোধ হয় প্রণয়ীরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চেতন।

এমনি বর্ষাঘন সজল রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে মুখোমুখি গল্প করে। কেষ্ট ফটিককে শোনায় তার বাল্যের কথা। তার শৈশব জীবনের কথা। ফটিক শোনায় তাকে তার মার কথা। তার বাবাকে তার মনে পড়ে না। তার বাবা ছিল ভক্তর ভাই-পো। খুব অল্পবয়সেই তার বাবা মারা যায়।

অনেক দুঃখ কষ্টের জীবন কেষ্টর। নবদ্বীপের কাছে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। সৎমা তাকে মানুষ করে। বাপের মৃত্যুর পর তার সৎমা আরেকজন আখরাধারী বৈষ্ণবের সঙ্গে কণ্ঠিবদল করে সেই আখরার বাসিন্দা হলো। সঙ্গে কেষ্ট গেল আখরায়। কেষ্ট সেই আখরার যাবতীয় কাজকর্ম করতো। প্রায় দাসিবৃত্তির মতো। নির্যাতন ও অনেক সহ্য করতে হতো, বিমাতা ও তার স্বামীর কাছে।

অনেকেই যেতো কেষ্টকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, কিন্তু তার অভিভাবকেরা রাজি হতো না। বোধ হয় দরে বনতো না। তারপর—

কেষ্ট হাসতে হাসতে তার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে, তারপর একদিন তেপান্তর পেরিয়ে স্বপ্নের রাজপুত্তুরের মতো হাজির হলো

তোমার ঠাকুরদা।' কী কথা হলো ওনাদের সঙ্গে তা ওনারাই জানে। তবে টাকার থলি ঝেড়ে বেশ মোটা রকমের দাম দিয়েছিল শুনেছি।

ফটিক হাসতে হাসতে হাসতে বলে, কসাইকে গাই বেচলে ভালো দাম পাবে বই কি! তারপর বিয়ে?

কেষ্ট ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিল, বিয়ে না ছাই। টাকা বুঝে নিয়ে গাই-এর সিঙে তেল, হলুদ আর কপালে সিঁদুর দিয়ে হাতে দড়া তুলে দিল।

—কসাই দেখেও গাই শিঙনেড়ে পা তুলে লাফালো না?

—লাভ কি? আর তোমার কাছে সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেখান থেকে আসতেই চেয়েছিলুম। আমার সজ্য হচ্ছিল না দুটি ভাতের জন্যে, তাদের জ্বালা যন্ত্রণা। আর আখরার নোংড়া হাওয়া।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেষ্ট চুপ করে।

উৎসুক কণ্ঠে ফটিক জিজ্ঞেস করে, বিয়ের আর কোন কিছুই হয়নি? সত্যি কেষ্ট?

—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কোনো কিছু না।

—দিব্বি করতে হবে না গো, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। তারপর?

—তারপর আবার কি? ভারি দুষ্টু!

—সেখানে ক'দিন ছিলে?

—তিনদিন। এখানে আসবার আগে নবদ্বীপে একটা বাস্তিরদের ঘরভাড়া করেছিল। সেইখানে আমার সঙ্গে ভাব করেছে। আমার হাতে সগ্গ তুলে দিল। বাড়ি ঘর, খেত খামার, জমিজমা, গরুবাছুর সব আমাকে দেবে। দেবার লোক নেই।

ছেলেপিলে নেই। ভোগ করবার নোক নেই। তারপর তো সব জানো।

ফটিক দুষ্টুমি করে তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, কই, সব তো জানি নে।

কেষ্ট তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, হ্যাঁ, সেই পথম রাত্রেই আমাকে ওর রাক্কুসে খিদে মেটাতে হয়েছে, ভাত রেঁধে আর নিজের দেহ দিয়ে। তোমার কাছে বলতে আর নজ্জা নেই। দুখ্যুও নেই। এখন ভাবি নিজেকে না হারালে তো তোমাকে পেতুম না।

দুজনেই খানিক চুপ করে থাকে। কেষ্ট আস্তে আস্তে তার গায়ে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, তার জন্যে আমাকে তোমার ঘেন্না হয়, না?

ফটিক তাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলে, ছি, কেষ্ট। ও কথা বলোনা। তুমি আমার কাছে দেবতার নামের মতো পবিত্য। তোমার ভালোবাসা তোমাকে শুদ্ধু আর পবিত্য করে দিয়েছে।

কেষ্ট তার বিস্তৃত বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদে। আনন্দের কান্না। তৃপ্তির কান্না।

ফটিক এসে কেষ্টকে বলে, এইবার ঘর ছাইবার সময় হয়েছে কেষ্ট। আর হাতগুটিয়ে বসে থাকা চলে না। তীথ্য যাত্তিররা ফিরে আসছে রথের পর। রাজলক্ষ্মী পিসির চিঠি এসেছে। ওরা কাশীতে এসেছে।

কেষ্ট ফিক করে হেসে ফেললে: তা হলে?

ফটিকের মুখে নরম গাম্ভীর্য। দাওয়ায় বসে বললে, উপায় তো করতে হবে।

কেষ্ট ও তার সামনে পা মুড়ে বসলো।

—কী উপায় করবে?

মৃদু হেসে ফটিক বললে, তোমার কত্তা এসেই তো তোমার দিকে হাত বাড়াবে। ঠেকাবে কেমন করে?

কৃত্রিম ক্রোধে কেষ্ট ঝলসে উঠলো, ও সব কথা বলো না বলছি তুমি। আমার কত্তা? তুমি কে? তোমার ঠাকুবাবা আমারো ঠাকুবাবা। হাত বাড়াবে? ইস! বাড়াক না হাত? মুচড়ে হাত ভেঙে দোবনা?

ফটিক কেষ্টর ক্রোধ-কম্পিত আরক্ত মুখের পানে চেয়ে হাসি চাপতে পারল না। সে হাসি চাপবার জন্যে গামছা দিয়ে মুখ মুছলে।

কেষ্ট বললে, ওসব নিয়ে রঙ্গ করোনা তুমি। তুমি চুপ করে থাকো। আসুক না। কেমন করে ঠেকাবো আমি জানি। আমি জানি ওর চোখে আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে।

ফটিক গম্ভীর হয়ে বললে, আঁচল চাপা দিয়ে কদ্দিন রাখবে? আর সে তো লুকোচুরি খেলা। ওর মধ্যে আমি আর নেই। তুমি যে ওর বউ সেজে আমার সঙ্গে গোপন সম্বন্ধ বজায় রাখবে সে হবে না। সে আমি সইতে পারবো না।

—তবে?

ফটিকের মুখের কাঠিণ্য, তার পৌরুষ কণ্ঠস্বর কেষ্টকে চকিত করে তুললো। তার সঙ্কল্পের উত্তাপ ওর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ওকে উত্তেজিত করে তুললো।

ফটিক গাঢ়স্বরে বললে, আমি যা করবো বা করেছি, বলি

শোন। চমকে যেয়ো না। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই করেছি। তুমি অমত করবে না ভেবেই করেছি। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমি সকলকে সব কথা খুলে বলেছি। কেমন করে তোমাকে ও নিয়ে এলো। কেমন করে আমার মায়ের কাছ থেকে টাকা আনলো সব বলেছি। আমি হাঁপিয়ে উঠছিলুম কেষ্ট আমাদের ভালোবাসার কথা সকলকে জানাবার জন্যে। তোমাকে চোরাই মালের মতো লুকিয়ে রাখতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। শিবতলায় বাবুদের কাছে আমি আজ সব স্বীকার করে তোমাকে বিয়ে করবার আশীর্ব্বাদ চেয়েছি। হয় কলকাতায় কালীঘাটে নয় নবদ্বীপে গিয়ে তোমায় বিয়ে করবো, বুড়ো বাড়ি ফিরে আসবার আগেই।

কেষ্ট বিমূঢ় বিস্ময়ে তারপানে চেয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

ফটিক বললে, কী বিশ্বাস হলো না বুঝি? হ্যাগো, এ বিয়ে হয়। এ বিয়ে অশুদ্ধ নয়, কারণ তোমার বিয়ে হয় নি। তোমার মা'র ও আখরার মোহন্তর চিঠি আনিয়েছে পান্নুদা। তারা লিখেছে তোমাকে ও নাতির সঙ্গে বিয়ে দেবে বলেই নিয়ে এসেছে। সে চিঠি আজ শিবতলায় পান্নুদা সকলকে দেখিয়েছে।

—সেখানকার চিঠি এলো কেমন করে?

—মেজদা সেখানে চিঠি লিখেছিলো আমার জবানীতে। তারি জবাব এসেছে।

কেষ্ট বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ছোট্ট করে বললে, তুমি কি গো?

—আমি মুরুখ্যু চাষার ছেলে হলেও আমি মানুষ কেষ্ট। আমাকে পাঁচজনে ভালোবাসে।

কেষ্ট চুপ করে অদ্ভুত চোখে তারপানে চেয়ে রইলো। যেন নতুন মানুষকে দেখছে।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, যাকে আদর করে বুকে তুলে নিয়েছি তাকে বুক থেকে নামিয়ে দোব কেমন করে?

কেষ্ট কম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করলে, গাঁয়ের সব কি বললে?

—কী আর বলবে? ও হারামজাদাকে কি কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে? এখন আমাদের জ্ঞাতগুষ্টিরা কি বলে তাই দেখি।

—ওদেরো বলেছো?

—মনীন্দর খুড়োকে বলেছি। সেই সকলকে বলবে।

কেষ্ট বললে, কিন্তু এসে যে মহাপ্রভু আমাদের আস্তো রাখবে না।

—ইস্, মগের মুল্লুক কিনা! সে হিম্মৎ ওর নেই। গাঁয়ের লোক যদি আমার পক্ষে হয় ওর সাধ্যি কি? আর গাঁ ছেড়ে যদি যেতেই হয় সকলকে জানিয়ে যাওয়াই ভালো। লুকিয়ে যাবো কেন? পরের বউ নিয়ে পালাবো কেন? নিজের অধিকার পাকা করে নিজের বউ-এর হাত ধরে গাঁ থেকে চলে যাবো।

কেষ্টর দু'চোখে অশ্রুর দুটি দীর্ঘ ধারা নামলো।

তার ভালোবাসা সার্থক হয়েছে মনে হলো। ফটিকের প্রেম যে এতো দুঃসাহসী কেষ্ট বুঝবে কেমন করে?

ফটিক বললে, মেজদার দল আমার পক্ষে। তাদের সাহসেই আমার সাহস। কাল বর্ধমানে গিয়ে মহাপিসিকে সব বলবো। আর মেজদাকে দিয়ে শিবদাকেও বলাবো।

শিবদা বর্ধমানের উমাচরণ উকিলের বড় ছেলে। তিনিও উকিল। গ্রামের তরুণদলের অধিনায়ক বলা চলে।

—কিন্তু তোমাদের জাতগুষ্টি কি এটাকে ভালোচোখে দেখবে ?

—নাই দেখলো। বিয়ে করে এসে সব নেমতন্ন করবো। দেখি না কেউ আসে কিনা।

কেষ্ট মুচকে হাসল। তার বুকের নিচেটা থর থর করে কাঁপতে থাকে।

ফটিক বললে, হাসি নয় কেষ্ট। রীতিমত ঘটা করে বিয়ে করবো। ঠানদিকে বিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ করেছে নাকি ? মরদের বাচ্ছা আমি। যা করবো খোলাখুলি করবো। বুক ফুলিয়ে জানিয়ে করবো। তারপর যা আছে অদেষ্টে।

কুড়মুনের হরিপণ্ডিত মশায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত। কোলকাতার বড়ো বড়ো ঘরে বিধান দেন তিনি। তাঁর বিধান অকাট্য। পান্নু তার কাছ থেকে বিধান এনেছে। 'মেয়ের বিয়ে যদি ধর্মমতে না হয়ে থাকে, বিয়ের কোন বাধা নেই।

পান্নু বলে, তবে আর বাধাটা কোনখানে ?

পান্নু মেজদার দলের মুখপাত্র। মেজদার দল উঠে পড়ে লেগেছে। উদার নীতিক দল। তারা দু দুটো তরুণ জীবনকে ব্যর্থ হতে দেবে না। তা ছাড়া ভক্তর এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চায়। ভক্ত আজীবন ফটিকের ওপর অন্যায় করেছে। নাতনীর বয়সী একটা মেয়ের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার করেছে।

গাঁয়ে ঢিঢি হয়ে গেছে। ফটিক তার ঠাকুমাকে বিয়ে করতে চায়। ঠাকুমার সঙ্গে নাতির রসের সুবাদ। তাই বলে সত্যিকার বিয়ে করবে কি ? এমন অনাসৃষ্টি কথা কেউ কখনো শুনেছে নাকি ?

একটা রসের খোরাক পেয়ে গাঁ যেন চোল্‌কে উঠেছে। বিশেষ মেয়ের দল।

পাড়ায় পাড়ায়, পুকুর ঘাটে, ঘরে বাইরে ঐ এক কথা। ঠাকুমার সঙ্গে নাতির বিয়ে।

শুনেই সব আকাশ থেকে পড়ে। যারা আদিপুরাণ জানে তারা জলে পা ডুবিয়ে, আঁট হয়ে বসে ভক্তুর গুনের কথা বর্ণনা করে। মেয়েটাকে আসলে ফটকের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলেই নিয়ে আসে। পথে মেয়েটাকে নষ্ট করে নিজের বউ সাজিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। মেয়েটা ছোঁড়াকে সব খুলে বলে। আবার এদিকে ফটকে গাজনের সময় খবর পায়, ভক্ত তার মা'র কাছ থেকে দু'হাজার টাকা এনেছে ফটকের বিয়ে দেবে বলে।

মেয়ের দল অবাক হয়ে গালে হাত দেয়। সন্ধ্যে উৎরে যায় তবু তাদের জলে নামা হয় না। মেয়েটার নাকি বেশ ভদ্র চেহারা। ফটিকের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে। সে তাকে বিয়ে করবার জন্য কোমর বেঁধেছে। বুড়োর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করবে।

ছেলেটার বুকের পাটা আছে। ঢাক ঢাক গুর গুর নেই। সোজা এসে গাঁয়ের ভদ্রলোকের শরণ নিয়েছে। সব কথা স্পষ্ট খুলে বলেছে।

প্রায় সকলেরি সমবেদনা ফটিকের আর মেয়েটার জন্যে।

সদলে পানু গিয়ে ফটিককে সাহস দেয়, কুছ পরোয়া নেই রে ফটকে। তো বেটাকে আমরা ভোটে জিতিয়ে দোব। আমাদের টিকিট নিয়ে নেমেছিস যখন, তখন তোর কোন ভাবনা নেই। ভক্তা বেটা তোপে উড়ে যাবে।

কেষ্ট আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পানুকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো নেয়।

—ইস। ভারি ভক্তি যে রে ফটকে।

পান্নু ফস ফস করে সিগ্রেট টানে।

ফটিক হাসতে হাসতে বলে, বসো তোমরা। চায়ের জল চাপিয়েছে।

—ও রমেশ, বলে কি রে? চা?

রমেশ বলে, আমাদের সামনে একবার মনীন্দ্রকে তুই ডাক। তোদের পাড়ার খপরটা জেনে যাই।

মনীন্দ্র এসে বলে, হরি পণ্ডিত মশায় যেখানে বিধেন দিয়েছেন, সেখানে আবার আমাদের চাষারা বলবে কি গো রমেশ ভাই? আর ভক্তখুড়োতো আমাদের মুখে কালি মাখিয়েছে। এ কি মানুষের কাজ? আমাদের সমাজ ওকে একঘরে করবে।

—তা করুক। তবে ফটকের বিয়েতে সব নেমন্তন্ন খেতে আসবে তো?

পান্নু জিজ্ঞেস করলে।

—তা আসবে মনে হয়।

—মনে হয় কি রে? মাংস, ভাত, বোঁদে, পায়েস। যে যতো পারে। ঢালাও বেবস্থা।

সকলে হেসে উঠলো।

পান্নু চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললে, ফটকে মরাই খোল। ধান বেচে টাকার বেবস্থা করে রাখ।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, না গো, পান্নুদা। ধান বেচতে হবেনা। আমার বিয়ের টাকা মজুত আছে। আমার মায়ের আশীর্ব্বাদী টাকা।

যে মায়ের নাম উচ্চারণ করতে কুণ্ঠা বোধ করতো ফটিক, সেই

যাকে আজ গর্বের সঙ্গে প্রচার করে দিল, তার দেওয়া টাকাকে আশীর্বাদ বলে তুলে ধরল।

হরি পণ্ডিত মশায়ের আদেশ অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দিয়ে কালীঘাটে কেষ্টর অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করানো হলো দিবা দ্বিপ্রহরে এবং বিবাহ হলো রাত্রে সুতহিবুক যোগে শুভলগ্নে। অগ্নি সাক্ষ্য করে, নারায়ণ শীলার সম্মুখে। ব্রাহ্মণ, নাপিত ও বরযাত্রিদের সাক্ষী রেখে। গ্রামের যারা কলকাতায় থাকে, খবর পেয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছিল বিবাহ সভায়।

এই আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যেও কেষ্ট শুধু কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে কাঁদে। চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারে না। মুখে আঁচল ঠুসে দিয়ে কান্না রোধ করবার চেষ্টা করে। তবু পারে না।

এ সব যে তার ধ্যান ধারণার বাইরে।

তাকে সুখি করবার জন্য এতো আয়োজন। এতো অনুষ্ঠান। এতো সম্মান দিয়ে ফটিক তাকে নিজের করে নেবে। এতো সম্বর্ধনা করে তাকে আহ্বান করে নিয়ে যাবে তার ঘরে? আজীবনের সাথি করে?…ওগো তুমি আমায় এতো ভালোবাস?

সে কৃতজ্ঞতা ভরা অশ্রুবিগলিত চোখে ফটিকের পানে চায় আর ফুলে ফুলে কাঁদে। ফটিক তাকে চোখের ইঙ্গিতে শাসায়।

কিন্তু কান্না সে থামাবে কেমন করে? তার দেহমন যে ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে শুধু কাঁদতে চায়। তার বুকভরা ভালোবাসা অশ্রু হয়ে ওর চরণে ঝরে পড়তে চায়।

যতো না ভালোবাসা ততো ভক্তি। যতো না প্রীতি, ততো শ্রদ্ধা। বুকের চেয়ে পা ছোঁবার আকাঙ্ক্ষাই তার বেশী।

ফটিক তার করতলে কর রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করেছে। ঈশ্বর সাক্ষী করে সে হোমাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রহণ করেছে। সীমন্তের অলীক সিঁদূররেখা মুছিয়ে নতুন করে মন্ত্রঃপূত সিঁদূর পরিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাকে পবিত্র করে তুলেছে। তার বিড়ম্বিত অতীতকে জীবন থেকে মুছে দিয়েছে।

নিজেকে রাহুমুক্ত মনে হলো।

এ তার নবজন্ম।

গ্রামে ফিরে তাদের ফুলশয্যা হবে। বউভাত হবে।

না। আর কোন গোপনতা রইলো না। কোন আড়াল রইলো না। ফটিকের বউ বলে সে গৌরব করতে পারে বই কি? ফটিকের সন্তানের মা হবার অধিকার তার সংরক্ষিত।

না। অদৃষ্টের কাছে চাইবার আর কিছু রইলোনা। এই ভরাসুখ নিয়ে মরতেও তার দুঃখ নেই।

কেষ্ট কখনো কলকাতা দেখেনি। অন্তত তাকে চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর দেখিয়ে তবে রাতের গাড়িতে তারা গ্রামে ফিরবে।

যেদিন ভোরে ফটিক কেষ্টকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করে সেই দিনই দুপুরে ভক্ত ও তীর্থ যাত্রিদের বর্ধমান পৌঁছবার কথা। কাজেই ফটিক যে গাড়িতে বর্ধমান এসেছিল সেই গাড়ি স্টেশনে রইলো ভক্তর জন্য। ভক্ত এলে ভক্তকে নিয়ে গাড়ি ফিরবে। কৃষাণ বাহাল ধাওয়াকে গড়ে পিটে রেখেছিল ফটিক আর পানু। গাঁয়ে পৌঁছবার আগে তাদের কলকাতা যাত্রার কথা যেন ভক্তর বা অন্য কারো কানে না ওঠে। বাহাল কেন, সকলেই ভক্তর শোচনীয় পরিণামটা উপভোগ করতে চায়। এ এক নতুন ধরণের আনন্দ। এমন তো সচরাচর ঘটে না। তা ছাড়া বাহালের বুঝতে

বাকি নেই যে ফটিকই তার আসল প্রভু। এবং কেষ্ট তার প্রভুপত্নী। কেষ্টর মায়া মমতাভরা অন্তর আর হাসিভরা মুখ তাকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। সেই সরল বালিকাকে ভক্ত প্রবঞ্চনা করেছে তার জন্য ভক্তর উপর তার রাগও হয়েছে।

বেলা বাড়লে তীর্থ যাত্রিদের জন্য আরো ক'খানা গ্রামের গাড়ি এলো। বাহাল তাদের ও মানা করে দিল কথাটা এখানে বলতে।

সকলে হাসাহাসি করল।

ভক্ত এলো। বাহালকে জিজ্ঞেস করলে বাড়ির খবর। বাহাল আড়ে ঠারে কথার জবাব দিল। তল্পিতল্পা নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বেমালুম কথাটা চাপা পড়ে রইল, যতোক্ষণ না গাড়ি এসে পাঠে পুকুরের ঘাটে পৌছলো।

সন্ধ্যে হয় হয়। মেয়ের দল ঘাট থেকে সবে উঠে এসে পথে দাঁড়িয়েছে। ধুলো উড়িয়ে এক সঙ্গে তিন চার খানা ছৎরি দেওয়া গাড়ি আসতে দেখে তারা থমকে দাঁড়ায়। তীর্থ যাত্রিরা আসছে। মেয়ের দল গাড়ি ঘিরে দাঁড়ালো।

পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যাত্রিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে পূর্ণকলস থেকে তাদের পায়ে জল ঢেলে দেয়।

কুশল আদান প্রদানের মধ্যেই একজন বললে, ও চণ্ডি, আজ যে তোর গেঁদাফুলের বিয়ে লো?

ঠাট্টা ভেবেই চণ্ডী কটাক্ষ হেনে হাসতে হাসতে বললে, আমার গেঁদাফুল আইবুড়ো নাকি যে বিয়ে?

চোখের কোণ দিয়ে ভক্তর পানে চেয়ে চণ্ডী বললে, তবে বর তীথ্যি করে এলে নতুন করে ফুলশয্যে হয় শুনেছি। বামুন সজ্জন খাওয়াতে হয়।

—সে কি লা, সত্যি শুনিসনি ? বর্ধমান থেকে সারাপথ এলি, আর গাঁয়ের সেরা খপরটা শুনলিনি ? তোমরা কেউ শোনোনি ?

—গাঁয়ে যে রুক্মিণী হরণের পালা হয়ে গেল।

—সে আবার কি ?

চণ্ডী অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

—ঐ ভক্তর নাতি ফটিকের সঙ্গে তার ঠাকুমার আজ বিয়ে হচ্ছে। কোলকাতায় কালিঘাটে। আজ ভোরে তারা কোলকাতা গেছে।

—অজান্তে ভক্তর শরীরটা শিউরে উঠলো। তবু সে মুখে হাসল।

—ছেলের দল বরযাত্তির হয়ে সঙ্গে গেছে।

ভক্ত ভাবে খুব একটা ঠাট্টা হয়তো। বোধ হয় তীর্থযাত্রার শেষে এরকম ঠাট্টা করতে হয়। কুঞ্জভাঙার গানের মতো।

চণ্ডী হাসি-কান্না মেশানো মুখে আর গলা-কাঁপানো মরাকান্নার সুরে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবারে, আমার বুক গেলরে। ওগো, তোমরা খুলে বলোগো, আমার গেঁদাফুলের কি হয়েছে। কোথায় আছে সে। ওরে গেঁদাফুলরে—

রসিক গোঁসাই ধমকের সুরে বললে, আঃ। থামনা তুই চণ্ডি। ব্যাপারটা কি হয়েছে গো মেয়েরা ?

ভক্ত তড়াক করে এগিয়ে এসে বুকফাটা গলায় বলে উঠলো, হবে আবার কি ? ধুলো-পায়ে আমার সঙ্গে একটু রঙ্গ করছে। হাঃ হাঃ।

সশব্দে হেসে উঠলো ভক্ত।

চণ্ডী অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে তার মুখের কাছে হাতনেড়ে বললে, হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয় রে মিনসে। পাখি যে শেকল কেটেছে রে সব্বনেশে।

—ইস।

ভক্ত কটমট করে চণ্ডীর পানে তাকাল।

হাজরাদের শৈল তখন কাঁকাল থেকে কলসীটা নামিয়ে রেখে, অশথ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে রসান দিয়ে বিবৃত করল, ফটিক-কেষ্ট লীলা।

মাঝ পথেই চণ্ডী হাসতে হাসতে কোমরে হাত দিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল: ওরে বাবারে, আর পারিনে রে গেঁদাফুল! তোর মনে এতো ছিল!

ঝাঁক ঝাঁক দৃষ্টি একসঙ্গে জড়ো হয়ে তীরের মতো বিঁধছে ভক্তর মুখের ওপর। রসিক গোঁসাই স্থির বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে আছে তার মুখের পানে। মুখ নয় মরার মাথা। ফাঁসিতে ঝোলানো বিকট বিকৃতমুখ। আধ্-পোড়া ঝলসানো মুখ।

চণ্ডী তার মুখপানে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসে আর বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ওরে গেঁদাফুল রে!

শৈল শেষ করে থামলো। বুনো মোষের মতো মোটা ঘাড় বেঁকিয়ে ভক্ত গর্জে উঠলো, মিথ্যে কথা।

জবাব দিল চণ্ডী: সব মিথ্যে। শুধু সত্যি তাদের পেরেম। তাদের কীর্তি। যে যা বলে বলুক, এই কীর্তিই ওদের বাঁচিয়ে রাখবে চিরদিন এ গাঁয়ের মাটিতে। ওদের পেরেম সত্যি বলেই ওরা পেরেছে আড়াল ঠেলে বেরিয়ে আসতে। আমার হিংসে হচ্ছে। তাদের ভালোবাসার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ক্ষেপে উঠলো ভক্ত। চিৎকার করে উঠলো, আমার কেষ্ট পেরেম করবে ফটকের সঙ্গে? কেষ্টকে তোমরা জানো না। তাকে ভাঁওতা দিয়ে ফুসলে নিয়ে গেছে। জোর করে নিয়ে গেছে ঐ গুণ্ডো খানকির ছেলে! শালাকে খুন করবো আমি।

রসিক গোঁসাই এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। এইবার সহাস্যে বললে, ক্ষেপিস নি ভক্ত। ক্ষেপিস নি। দশচক্রে ভগবান ভূত। তুই কোন ছার। আর হরিপণ্ডিত মশায় যে বিধান দিয়েছেন তা অকাট্য। কাজটা তো তুই ভালো করিসনি। তোর সঙ্গে বিয়েই হয়নি, অথচ বাচ্ছা মেয়েটাকে তুই ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করেছিস। শুধু পাপ নয় ওটা। আইনের চোখে গুরু অপরাধ।

—ছিঃ! ছিঃ!

মেয়ের দল অস্ফুট গুঞ্জন তুলল।

ভক্ত বললে, বিয়ে হয়েছে বই কি! কণ্ঠিবদল করে।

শৈল বললে, ওর মা চিঠি দিয়েছে, নাতির সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে।

—ও সব চক্কান্ত। পানু ঠাকুরের চক্কান্ত। বোঁটার ফুল খসেনি গাঁয়ের মুরুব্বি হয়েছে।

চণ্ডী ঝলসে উঠলো, হ্যাঁরে, বিটলে। পানুঠাকুর মালিনী মাসি কিনা—

হো হো করে হেসে উঠলো গোঁসাইজী। বললে, এক চিন্তা দুই মনে। আমি ভাবছিলুম বিদ্যাসুন্দরের কথা। বর্ধমানের মাটির গুণ আছে। এটা বিদ্যাসুন্দরের দেশ।

চণ্ডী হাসল। বললে, ভাগ্যিস আমি এখানে ছিলুম না। নইলে আমিই মালিনী বনে যেতুম। যে সুনাম চণ্ডীর।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। জাঁকালো জমকালো চাঁদ। বাঁশবনের পাতাগুলো চাঁদের আলোয় জ্বলছে। শুধু জ্বলছে নয়, শির শির

করে কাঁপছে। বাতাসে নয়। চাঁদের আলোর ছোঁয়া লেগে। পরপুরুষের স্পর্শে মেয়েরা যেমন কাঁপে। নবদ্বীপের যাত্রিনিবাসের নিভৃত ঘরে প্রথম রাত্রে কেষ্ট যেমন কেঁপেছিল ভক্তর স্পর্শে। মূর্চ্ছাহতের মত অন্ধকারে লজ্জায় কণ্টকিত তনুদেহখানি তার সম্ভোগের জন্য দান করতে বাধ্য হয়েছিল।

ভক্তর রাগ, হিংসা নিভে গেছে বোধ হয় চাঁদের পানে চেয়ে। স্তিমিত হয়ে এসেছে ফটিকের ওপর প্রতিশোধ নেবার বিদ্বেষ বহ্নি। মনে পড়েছে নিজেকে আর কেষ্টকে। দীর্ঘদিন পরে সে কেষ্টকে কামনা করেছিল মনে প্রাণে। আশায় বুকভরে সে প্রত্যাবর্তনের পথটিকে রঙিন করে তুলেছিল। কেষ্টর মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকটা টুকিটাকি উপহারও কিনেছিল তীর্থপথে। কেষ্টর মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু কল্পনা করেই মনে উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছে। আনন্দ অনুভব করেছে। সে আনন্দ তার একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আবছা আলোয় দাওয়ার উপর বসে ভক্ত আকাশ পাতাল ভাবছিল। ঘরের ভিতর গুমোট। বুকের ভিতর জ্বলছিল আক্রোশের আগুন। ঘরে সে থাকতে পারেনি। তাই দাওয়ায় এসে বসেছে। সন্ধ্যা থেকে সে অন্ধ আক্রোশে গজরেছে আর প্রতিহিংসার কথাই ভেবেছে।

এখন সে কেষ্টর কথা ভাবছে। কেষ্টর শান্ত সুন্দর মুখখানি তাকে প্রচণ্ড টানছে। রাত্রি যত গভীর হচ্ছে তার ভিতরকার দীর্ঘদিনের উপবাসী জীবটা যেন বেরিয়ে এসে দাপাদাপি করছে। তার ক্লান্ত দেহমন আরামের আশ্রয় খুঁজছে।

আকাশে মেঘের আভাস। ক'টা তারা থেকে থেকে দপ্ দপ করে জ্বলছে অতৃপ্ত কামনার মতো। নিজেকে তার ভারি একা আর

বিচ্ছিন্ন মনে হলো। তার কেউ নেই। স্ত্রী নেই। সন্তান নেই। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। এই একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যই সে কেষ্টকে চেয়েছিল। পেয়েছিল কেষ্টকে। নিজের সুখ সম্ভোগের জন্য কেষ্টকে পেয়ে সে স্বর্গসুখ অনুভব করেছিল। তার দৃঢ়মূল ধারণা জন্মেছিল কেষ্ট তাকে ভালোবাসে। বাঙালী কুমারী মেয়ের অক্ষত কৌমার্য দান একটা বিচিত্র বন্ধন। সেই বন্ধনের জোরে নিম্নশ্রেণীর বহু স্ত্রীপুরুষ আজীবন একত্রে বসবাস করে। প্রথম যাকে দেহ ছুঁতে দিল, শেষ পর্যন্ত তাকে ছুঁয়েই সে থাকতে চায়। ভক্তর ধারণা জন্মেছিল কেষ্ট সেই জাতের। কেষ্টর মাঝে সে জীবনের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু সে যে তার মৃত্যু হয়ে দেখা দেবে সে ভাববে কেমন করে?

কেষ্টকে পেয়ে সে ধার্মিক হতে চেয়েছিল, সে ভদ্র হতে চেয়েছিল। সে সংসারকে নতুন চোখে দেখতে চেয়েছিল। কেষ্টকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিল। এখনো সে বিশ্বাস করতে চায় না যে কেষ্ট বিশ্বাসঘাতিনী। কেষ্ট স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। নিঃসন্দেহ ফটিকের প্ররোচনায় লুব্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। তীর্থযাত্রার আগের রাত্রির কথা মনে পড়ে ভক্তর। মনে পড়ে কেষ্টর আসন্নবিরহকাতর মুখখানি। তার ছলছল দুটি চোখ। তার আর্তস্বর। তার অকপট অনুরাগ।

তাকে সে অবিশ্বাস করবে কেমন করে?

তীর্থের লোভে, পুণ্যের লোভে সে কেষ্টকে হারাল। বেড়ালের কাছে মাছ সমর্পণ করে দিয়ে নিজের এই সর্বনাশ করল। কেষ্টর দোষ কি?

বনান্তরালে শেয়াল ডেকে রাত্রির তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করল। ভক্তর চোখে ঘুম আসে না। সে আবার তামাক ধরায়।

তামাকের ধোঁয়ায় তার ক্লান্ত নির্জীব স্নায়ু-তন্ত্রীগুলো আবার শক্ত ও আঁট হয়ে ওঠে। কেষ্টকে ফিরে পাবার আশা জাগে। কুহকিনী আশা সাপের মুখে ভেক নাচায়। হয়তো এ সব মিথ্যা। মিথ্যা-রটনা। এমনো তো হতে পারে কেষ্টকে ফটিক কলকাতা নিয়ে গেছে। কলকাতা দেখবার শখ তার অনেকদিনের।

না। না। কেষ্ট অসতী নয়। কুলটা নয়। বিশ্বাসঘাতিনী নয়। সে তো কখনো তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি।..

ভক্তর দৈবাৎ মনে পড়ে টাকার কথা। সে বিশ্বাস করে তার সর্বস্ব তার হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিল। সে বিশ্বাস কি—?

সে উঠে দাঁড়ায়। এখুনি সে পরীক্ষা করতে চায়। ঘরে আলো জ্বালে। বাক্স সরায়। পাথরের টালি সরায়। হাঁড়ির ঢাকা সরিয়ে ভিতরে হাত ভরে দেয়।

মাত্র একখানা নোট। দশটাকার।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শূন্য করলে যে সংসারের অকল্যান হবে।

কেষ্ট তো নির্বোধ নয়।

ফটিক কিন্তু ধানের মরাই-এ হাত দেয়নি। সে আগেই লক্ষ্য করেছে।

ভক্ত আবার উবু হয়ে বসে। একটা অস্থির কাঁপুনি জাগে তার সর্বাঙ্গে। ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মত। জ্বর এলো নাকি?

সে কাত হয়ে বালিশে মাথা দিয়ে পা দুটো দুমড়ে শুয়ে পড়ে।

সব ঝাপসা হয়ে এসেছে। চাঁদ সরে গেছে। তারাগুলো নিভে গেছে। বোধ হয় মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। হাওয়া উঠেছে। মেঘলা হাওয়া। বৃষ্টি হবে নাকি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সে সর্বস্বান্তের মতো শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

পাশের ঘর তালা বন্ধ। চাবিটা বোধ হয় সঙ্গে নিয়ে গেছে।

ভক্তর ঘরে কেষ্টর আর কোন কিছু নেই। একখানা শাড়ি নয়। চুলের একটা কাঁটা ফিতে পর্যন্ত নয়। এ ঘরের বাসিন্দা ও-ঘরে উঠে যাচ্ছে। বোধ হয় গোছগাছ করে রেখে গেছে। এসে শুধু বিছানাটা পেতে নেবে। ফুলশয্যা হবে। চিরদিনের মতো তার হাতেগড়া কেষ্ট ফটিকের বিছানায় নিজের ঠাঁই করে নেবে।

আবছা অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ভক্তর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেষ্টর নরম তুল-তুলে দেহটা ফটিকের আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট। দুটো দেহ মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আনন্দের স্বাদ পেয়ে কেষ্টর তরুণ দেহ যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে। পাওয়ার তৃপ্তিতে ঝলমল করছে। তার চোখে এক নতুন ধরণের দৃষ্টি। তার কাছে অন্ধ অচেতন আত্মসমর্পণের দৃষ্টি নয়।

একটা অগ্নিশিখা ভক্তর হৃদয়ে জ্বলে উঠে তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজলো। তার মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণার ধ্বনি নির্গত হল। তার হাতদুটো নিসপিস করে উঠল। যন্ত্রণার মতো একটা অধীরতা তার কব্জির মধ্যে সে অনুভব করলে। হাতদুটো সে বারবার খুলতে আর মুঠো করতে লাগল।

ঝাপসা আলোয় চোখের সামনে ধরা দিল গোয়াল ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ আর রান্নাঘরের খড়ে-ছাওয়া চালগুলো। রোদে-পোড়া খড়গুলো যেন উইঢিপির মতো দেখাচ্ছে। এ সব তার হাতে-গড়া। মমতা দিয়ে গড়া।

নির্মম, ভয়াবহ একটা কল্পনা তার রক্তস্রোতে আগুন ধরিয়ে দিল। তার পুরু ঠোঁটে একটা পাশবিক কাঠিণ্য ফুটে উঠল।

কল্পনাটা ভয়াবহ মনে হলেও ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ। সে দেশালাই-এর বাক্সটা হাতে নিয়ে ফস ফস করে জ্বালতে সুরু করল। জ্বালে আর উঠোনে ছুড়ে ফেলে দেয়। মনের ভিতর

একটা হিংস্র কামনাপূরণের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলল। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত একটা যন্ত্রণা। তার মনের ভিতর কি যেন ভেঙ্গে পড়ছে। কি যেন গলে যাচ্ছে।

তার চোখের সামনে বহ্ন্যুৎসব হচ্ছে। সব ঘরগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে মনে হলো। সে দেশালাইটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে উঠোনের ওপর দিয়ে দৌড়োতে সুরু করল। খামারে খড়ের পালুই। পালুই-এর পাশ দিয়ে স্খলিতপায়ে ছুটতে ছুটতে সে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় গিয়ে উঠলো।

ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

তালাটা হাত দিয়ে টেনে দেখল।

সেগুন কাঠের নক্সা করা পাল্লা। পিতলের কড়া লাগানো। চারু রায়ের কাঠ গোলায় তৈরি।

শখ করে তৈরি ঘরখানা।

টাকা অবশ্য ফটিকের মায়ের দেওয়া। ভয়বিহ্বল চোখে সে ঘরখানার পানে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

তার শিথিল মুঠো থেকে কখন দেশালাই-এর বাক্সটা খসে পড়ে গেছে সে জানতে পারে নেই। জানতে পারে নেই কখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে। কখন কৃষান বাহাল এসে গোয়ালে ঢুকেছে।

॥ এগারো ॥

চণ্ডী ছুটোছুটি করেছে।

গেঁদাফুলের বিয়ে। মাথা চুলকোবার অবসর তার নেই। বরকনে আসছে।

ভোরে বর্ধমান থেকে রওনা হলে জল খাবারের বেলায় বরকনে গাঁয়ে এসে পৌঁছুবে।

একদল দগড় পাঠাচ্ছে চণ্ডী বড়বাগানে। চন্দ্রদের বড় কাকীর কাছ থেকে তাদের পালকী খানা নিয়েছে। সেখানা হাজির থাকবে। বড়বাগান থেকে বরকনে পালকী চড়ে বাজনা বাজিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে। গাঁটছড়া বেঁধে যুগলে শিবতলায় ঠাকুর প্রণাম করে খিন্নিতলা দিয়ে রক্ষকালীর বেদী প্রণাম করে বাড়ি আসবে।

বাড়িতে যজ্ঞের ব্যাপার। মনীন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাদের পাড়ার মেয়েরা এসেছে রান্নার ব্যবস্থা করে দিতে।

মনীন্দ্রর মা সেকেলে বিধবা। তবুও এসে দাঁড়িয়েছে।

তরী-তরকারী, হাটবাজারে রান্নাঘরের দাওয়া থৈ থৈ করছে।

শুধু ফটিককে নয় কেষ্ট মেয়েটাকেও সকলে স্নেহের চোখে দেখে। মেয়েটা ভারি মিষ্টি আর মায়াবী। এই ক'টি দিনে সকলের মন কেড়ে নিয়েছে।

সকলে বর কনের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে আছে। বরকনের অভ্যর্থনার আয়োজন চণ্ডীর। চণ্ডীর মাটিতে পা পড়ছে না। সে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। তার আঁচল দুলছে। মুখে হাসির ফুলঝুরি ঝরছে।

—ওগো, ও বড়ো গিন্নি!

মনীন্দ্রর মা সম্পর্কে ভক্তর বউদিদি!

ভক্ত কখন এসে রান্নাঘরের উঠোনে দাঁড়িয়েছে কেউ জানতে পারেনি।

গলার স্বর শুনে অনেকে আড়ালে সরে গেল। অনেকে ঘোমটা টেনে জড়সরো হয়ে বসলো।

—কী বলছো গো? এসো। অমন চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

মনীন্দ্রর মা এগিয়ে এলো।

—এ সব ব্যাপার কী?

শুষ্ক কণ্ঠে ভক্ত জিজ্ঞেস করলে।

—ন্যাকা মিনসে কিছু জানেনা? নাতির যে বিয়ে? কেষ্টর সঙ্গে।

—তাই নাকি? কেষ্টর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। তোমার এঁটোকাঁটা খেয়ে তো মানুষ ছেলেটা, তোমারি এঁটোকাঁটা নিয়ে ঘর করুক। মন খুলে আশীর্ব্বাদ করো।

হেসে উঠলো ভক্ত। বিশ্রী বিকৃত হাসি।

—আমি কে? তালুই?

মনীন্দ্রর মা, হাসতে হাসতে বললে, ফোটকের বড়ো শালা।

চাপা হাসির তরঙ্গ উঠল মেয়েদের দলে।

—আমাকে তা হলে তোমরা ভূত না সাজিয়ে ছাড়বে না?

—তোমাকে আবার ভূত সাজাতে হবে কেন? তুমি তো চিরকেলে ভূত। ফটকের মতো রোজা ছিল তাই মেয়েটা রক্ষে পেলে। নইলে তো ওর ঘাড় মটকে ছিলে।

চণ্ডী এসে বাড়ি ঢুকলো। একটা দমকা হাওয়ার মতো।

থমকে দাঁড়াল ভক্তকে উঠোনে দেখে। কাছে সরে গিয়ে সুর করে গাইল ঃ

"সই কেমনে ধরিব হিয়া,
আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারি
আঙ্গিনা দিয়া॥"

তারপর অঙ্গভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বললে, আর হামলে কোন ফল হবে না গো কত্তা। গাই যখন দড়া ছিঁড়েছে তখন আর গোঁজে ফিরে আসবে না। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে হাসো। নাতি নাতবউ-কে আশীব্বাদ করে ঘরে তুলে নাও।

মনীন্দ্রর মা বললে, আমি সেই কথাই ওকে বলেছিলুম রে চণ্ডী। তোর এঁটোকাঁটা নিয়েই ছেলেটাকে সুখে ঘরকন্না করতে দে।

হঠাৎ ভক্ত ক্ষেপে উঠলো। সে আহত বন্য পশুর মতো চিৎকার করে উঠলো, সব জ্বালিয়ে দোব। পুড়িয়ে দোব। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে দূর করে দোব। এ আমার বাড়ি। আমার—

—কাকে তাড়িয়ে দিবি রে ?

উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, রসিক গোঁসাইএর সঙ্গে পূর্ণ আড্ডি এবং দখিন পাড়ার আরো কজন ভদ্র লোক।

ভক্ত তাদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে ঃ আপনারা আমায় বাঁচাও। আমাকে পাগল করে দেবে।

ভক্ত তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল।

সারা গাঁয়ের লোক পথে বেরিয়ে এসেছে। বর কনে দেখতে। দগড় বাজিয়ে পালকী করে বর কনে আসছে।

পানু বলে, আমাকেও হার মানিয়েছে এই চণ্ডী। ওদের

যখন শখ, ওঠ ফটকে পালকীতে। সবই যখন হলো তখন এটাই বা বাকি থাকে কেন?

রীতিমত শোভাযাত্রা করে শিবতলায় ঠাকুর প্রণাম করে আঁচলে চাদরে গাঁট বেঁধে বরকনে এলো বাড়িতে।

ফটিক আর কেষ্ট নিঃশব্দে কাঠ হয়ে বসে রইলো। তাদের নিজেদের আর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই। স্বকীয়তা নেই। তারা এখন এদের হাতের পুতুল। যেমন নাচাচ্ছে তেমনি নাচছে।

মেয়ে পুরুষে অবাক হয়ে তাদের পানে চেয়ে দেখে। ফটিকের পাশে কেষ্টকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে। ফটিকের জন্যই যেন কেষ্টকে তৈরি করেছিল বিধাতা।

রাত্রি জাগরণে ও পথের ক্লান্তিতে কেষ্টর মুখখানি শুকিয়ে গেছে তবু যেন তার বিশুষ্ক মুখে একটা কমনীয় স্নিগ্ধতা। তন্দ্রাজড়িত অর্ধনিমিলিত চোখদুটিতে সঙ্কোচের মাধুর্য।

প্রশংসাভরা মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দল তার দিকে চেয়ে দেখে। তাদের মনের দ্বিধা ও অবজ্ঞার ভাবটা তাদের অজান্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েটার প্রতি করুণায় মন তাদের ভরে ওঠে।

চণ্ডী ও পাড়ার মেয়েরা বর-কনেকে শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে ঘরে তুলে নেয়।

কেষ্ট চণ্ডীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আনন্দে, লজ্জায় কিংবা ভয়ে বোঝা শক্ত। চণ্ডীর মনে হয় তার সূক্ষ্ম গোপন প্রেম বাস্তবের কঠিন আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। সে তার হাসি ও কৌতুক দিয়ে ওর কান্না ঢেকে দিতে চায়।

চণ্ডী বললে, কিলো, ধরা দিতে লজ্জা নেই, যতো লজ্জা ধরা পড়ার না? তুই যে এতো গভীর জলের মাছ গেঁদাফুল, বুঝবো

কেমন করে? খুব করেছিস। কান্না রেখে এখন দুটো মনের কথা বল ভাই। একটু হাস।

কেষ্টর কান্না থামে না। চণ্ডীর বুক থেকে সে মাথা তোলে না।

চণ্ডী বলে, আমরা মিছে গেলুম বেন্দাবন দেখতে। আর এরা সব ঘরে বসেই বেন্দাবন লীলা দেখলে। "এই তো বৃন্দাবন। মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন"

বংশীর বদলে হঠাৎ দগড় বেজে উঠল।

—বাজারে বাজা। ওরে বাজা।

পান্নুর গলা শোনা গেল।

দগড়ের সঙ্গে সব নাচছে।

তুমুল আনন্দ কলরব উঠলো।

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে দগড়ের বাজনার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে ভক্ত নাচছে। হাতে তালি দিয়ে পানু তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নাচাচ্ছে। আর তাদের ঘিরে ছেলের দল সঙ্গে সঙ্গে নাচছে। অদ্ভূত সে নৃত্য! কখনো দড়ির ওপর বানর নাচের ভঙ্গিতে ভক্ত নাচছে। কখনো দ্রুততালে রাইবেশ নাচ নাচছে। বিকৃত মুখে বিকট ভঙ্গি। হাত, পা এবং রোমশ নগ্ন বুকের পেশীগুলো ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। মুখে একটা হুম্ হুম্ করে বিকট আওয়াজ করছে। মাথার সাদা পাতলা চুলগুলো উড়ছে।

সে এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য!

স্তব্ধ *নির্নিমেষে সকলে তার পানে চয়ে* আছে।

উন্মাদের মত ভক্ত নাচছে আর নাচছে। বাদ্যকরেরাও তার সঙ্গে মেতে গেছে।

ফটিক একটা খুঁটি চেপে ধরে দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে স্তম্ভিতের মত চেয়ে দেখছে। কেষ্ট চণ্ডীর পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ফাঁক দিয়ে দেখছে আর ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ভক্ত হাসছে। বিকট উল্লাসে হাসতে হাসতে বলছে, গাঁয়ে আর আছে কে? আর কারুর ক্ষেমতা থাকে নাচুক আমার সঙ্গে। দেখিতো। মায়ের দুধ খেয়েছি। আমার শিরে রক্ত আছে। তোদের মত কাদা গোলা জল নয়। আমার নাম ভক্ত মালিক। একা একগাছা লাঠি হাতে বিশজন লেঠেলের মওড়া নিয়েছি। জোয়ান? চলে আসুক। কে কতো জোয়ান একবার দেখা যাক।

ভক্ত কুস্তিগিরের মতো আস্ফালন করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুরে ফিরে আবার নাচে। বিকট উল্লাসে হুঙ্কার দিতে দিতে তাণ্ডব নৃত্য করে।

ছেলের দল ভয়ে সরে দাঁড়ায়।

ভক্ত দগড়দলের সঙ্গে একা নাচতে থাকে। পান্নু আর তার দলবল মাঝে মাঝে হৈ হৈ করে তাকে উৎসাহ দেয়।

তার দানবীয় শক্তির পরিচয়ে সকলে চমকে গেছে।

কেউ কেউ বলে, ও পাগল হয়ে গেল।

মুখ ভেংচে চণ্ডী বলে, মাথা! ও পুরুষত্ব দেখাচ্ছে গেঁদাফুলকে। নিজের শক্তি দেখাচ্ছে। যৌবন এখনো ফুরিয়ে যায়নি জাহির করতে চাচ্ছে।

হঠাৎ নাচতে নাচতে ভক্ত নিজের বুকে ঘুষি মেরে চিৎকার করে ওঠে, সাবাস্! বলেহার জোয়ান। লড়ে যাক আমার সঙ্গে, তবে বলবো বাপের বেটা। লড়ে আমার মেয়েমানুষ কেড়ে নিতে পারতো তবে বলতুম মরদের বাচ্ছা। হ্যাঁ!

হঠাৎ দৌড়তে সুরু করল ভক্ত।

—আরে চললি কোথা ভক্ত ?

—মদ খেতে। কেন, লড়বে নাকি আমার সঙ্গে ?

শূন্যে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ভক্ত মদ ছেড়ে দিয়েছিল। গলায় তুলসীর মালা পরে বৈষ্ণব সেজেছিল।

মালা ছিঁড়ে ফেলে, ভেক ছেড়ে দিয়ে আবার ভক্ত আগেকার মত শুঁড়ি বাড়িতে আস্তানা গাড়ল। মদ খেল, নাচল কুঁদলো, যতোক্ষণ না বেহুঁস হয়ে গেল।

কেউ কিছু বললো না। কেউ তাকে ডাকলো না। শেষে ক্লান্ত হয়ে নিজেই একদিন ফিরে এলো।

মণীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলে, কিরে, তোরা কি আমায় গাঁ ছাড়া করতে চাস ?

মণীন্দ্র বললে, আমরা কেন গাঁ ছাড়া করবো, এরপর নিজে থেকেই তোমার গাঁ ছেড়ে যাওয়া উচিত।

ভক্তর গলার স্বরটা অনেক নরম আর নম্র।

—কেনে ? আমার বাড়ি। আমার ঘর। আমি কোথায় যাবো ?

গুপি মোড়ল বললে, নবদ্বীপ কিংবা বিন্দাবনে গিয়ে থাকো। ফোটকে তোমায় কিছু কিছু খরচ দেবে। আমরা পাঁচজনে থেকে একটা বেবস্থা করে দোব।

মণীন্দ্র বললে, খুব ভালো কথা। ফটিককে আমি রাজি করে সব বেবস্থা করে দোব। এরপর ওদের নিয়ে একসঙ্গে ঘর করা তোমার চলবে না। আমরাও তোমাকে বলবো না। যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন ফটিক একটা তোমাকে মাসোহারা দিয়ে যাবে। কি বলো ? মন্দ কি ?

—আর জমিজমা, বাড়িঘর, চাষআবাদ ?

ভক্ত জিজ্ঞেস করলে।

—সব ফটিককে তুমি ছেড়ে দেবে। তা না হলে ও মাসের মাস টাকা গুণতে যাবে কেনে ? সব স্বত্ব তোমায় ছেড়ে দিতে হবে।

মণীন্দ্রর মা এসে দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিল। হাসতে হাসতে বললে, ছেড়ে তোমায় দিতেই হবে ভাই। ইচ্ছে করে না দিলে জোর করে কেড়ে নেবে। যেমন বউটি কেড়ে নিলে।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো। ভক্তর মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে মুখ নিচু করে বললে, তার সাধ্যি কি, তোমরা যদি তার ঠেস না হতে। দশে মিলে আমাকে ভূত করে দিলে বৈ তো নয়। নইলে ওর সাধ্যি কি ?

—এতো বড়ো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দশে দাঁড়াবে বই কি! নইলে যে অধম্মো হতো। তোমার পাপ যে ষোলকলা পুন্নো হয়েছিল, তাই ভগবান তোমায় কোল থেকে ফেলে দিলে। এ কি সয় ?

—ফোটকেকে যে এতোটুকু বয়েস থেকে মানুষ করলুম, তার বুঝি এই ধম্ম হলো ?

মণীন্দ্রর মা হাসতে হাসতে বললে, তাই তো বলছিলুম, এ শোধ তো ফোটকে নেয় নি। এ ভগবানের পিতিশোধ। ওদের দুটিকে উপলক্ষ করে তোমার ওপর শোধ নিলেন। ওদের দুজনের ওপর তোমার অত্যাচার ওদের দুজনাকে মিলিয়ে দিল। দুজনে মিলে তোমার ওপর শোধ নিলে। কার ওপর কি অন্যায় অত্যাচার করেছো, তোমার মন ভালো জানে। সে কথা বোলতে চাই না। এখনো পাঁচজনের পরামর্শ নিয়ে কাজ করো। যা সব শুনছি ওদের সঙ্গে শত্তুতা করতে গেলে নিজের হাতে দড়ি পড়বে।

ভক্ত শঙ্কিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত মুখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

মণীন্দ্র বললে, আমরা বলছিলুম মা, নবদ্বীপ হোক বৃন্দাবন হোক কোন তীর্থে গিয়ে থাকতে। ফটিক বছরশাল হোক মাসে হোক একটা খরচ দেবে।

—ভালোই তো। নবদ্বীপে বোষ্টমীর অভাব হবে না।

সকলে হেসে উঠলো।

মণীন্দ্র বললে, নইলে একসঙ্গে একবাড়িতে আর থাকা চলবে না। খুড়ো না গেলে ফটিক বলছিল সেই গাঁ ছেড়ে বউ নিয়ে কোলকাতা চলে যাবে।

ভক্ত উৎসুক দৃষ্টি মেলে তারপানে তাকাল।

পূর্ণ আড্ডি, রসিক গোঁসাই, চারু গোঁসাই প্রভৃতি দক্ষিনপাড়ার আতব্বররা পরামর্শ করে ঠিক করে দিল, ভক্ত গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে এবং কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করবে। ফটিক তাকে মাসিয়ানা ছ-শো টাকা দেবে। আর সমস্ত সম্পত্তিতে নিঃস্বত্ব হয়ে দলিল করে দেবে ভক্ত।

ভক্ত সম্মত হয়েছে। না হয়ে উপায় কি? জলের তোড় যে ঐ দিকে। শিববাবু উকিল দলিল সম্পাদন করে দেবেন।

কেষ্ট আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। ভক্ত বাড়ি ছেড়ে যেতে সম্মত হয়েছে শুনে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুড়োশিবের চরণে প্রণাম জানাল।

ফটিক তার মুখপানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, যা কিছু ঘটলো কেষ্ট, সব যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে।

কেষ্ট ধরা গলায় বললে, ঘটলো কেমন করে, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এখন শেষ রক্ষে হলে বাঁচি। ওকে আমি কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারি না। ওর চোখের চাউনি দেখেছিলে

সেদিন যখন নাচছিল। মানুষের চাউনি সে নয়। মনে পড়লে আমার রক্ত জল হয়ে যায়।

ফটিক তাকে কাছে টেনে নিয়ে রহস্য করে বললে, অথচ ঐ লোককে নিয়ে—

কেষ্ট হাতদিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। আর্তস্বরে বলে, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, সে কথা আর আমার মনে পড়িয়ে দিও না।

ফটিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, তুমি বড়ো ভীতু!

—সত্যি। আমি রাতে ঘুমোতে পারি না। ভয় হয় আমরা দুজনে ঘুমোলে ও বাইরে শেকল তুলে দিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারবে। ও সব পারে। বাতাসের শব্দ শুনে আমি শিউরে উঠি। গাছের পাতার শব্দে আমার বুক দুর দুর করে। মনে হয় ওর পায়ের শব্দ। আমি উঠে বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

ফটিক বলে, বাইরে যাও কোন সাহসে, যদি তোমায় একা পেয়ে তুলে নিয়ে যায়?

কেষ্টর মুখে বিবর্ণ হাসি ফুটে ওঠে। বলে, তা পারবে না।

ফটিক বলে, যাক বিদেয় হলে বাঁচি। এই কটা দিন বই তো নয়। তবু তো নতুন ঘরে শুচ্ছে তাই রক্ষে।

কেষ্ট হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ভিজে গলায় বলে, তবু তোমায় বলছি, একা কখখনো ওর সঙ্গে দেখা করো না। মাঠে ঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। ওকে আমি একটুও বিশ্বেস করি না। আমার কথা শুনো, লক্ষ্মীটি!

—সামনাসামনি ও কিছু করতে পারবে না। তবে পেছন থেকে চোরাগোপ্তা যদি—

—মোটকথা যদ্দিন ও এখানে আছে, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

ফটিক জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এখনো ওর তোমার ওপর লোভ আছে ?

—জানি না, যাও। যা বলছি শুনো।

সারারাত টিপিটিপি বৃষ্টি হয়েছে। শেষ রাতের দিকে চেপে বৃষ্টি নামলো। ধারালো ধারার বৃষ্টি।

মেজদার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

অন্ধকার ঘর। পূবদিকের জানলাটা খোলা ছিল।

মেজদা খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কালো মেঘ চিরে একটা সবুজ বিদ্যুৎ চমকালো। লিকলিকে বেতের মতো বিদ্যুৎ।

ভোর হয়েছে। ভোর হলেও বোঝায় না যে ভোর হয়েছে।

বৃষ্টির ঝাপটা এসে গায়ে ছড়িয়ে পড়লো।

মেজদা কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল। নিবিড় হয়ে উঠলো ঘরের অন্ধকার।

একদিনের জন্য কি কাজে গাঁয়ে এসেছে মেজদা। সকালেই বর্ধমান ফিরে যাবে।

সকাল হতে আর কত দেরী দেখবার জন্যই বোধ হয় বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে পাশ ফিরে ঘড়িটা দেখতে গেল।

টর্চের বোতাম টিপেই কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার সারা অঙ্গ অবশ হয়ে এলো। হাত পায়ের প্রান্তগুলো হিম হয়ে গেল।

কী সর্বনাশ ? মেঝের উপর চণ্ডী ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকারে নিজের চোখকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারলো না। আবার টর্চের বোতাম টিপলো।

উচ্ছল আলোক তরঙ্গে চণ্ডীর ঘুমন্ত দেহটা ভেসে উঠল। এলোমেলো, অসম্বৃত বেশবাস। বাহুর উপর মাথা রেখে ক্লান্ত হয়ে মেঝের মাদুরের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে। নিটোল ঘুমের স্পর্শে তার সমস্ত শরীর থেকে মুছে গেছে ব্যাকুলতার তাপ। মুখে ফুটে উঠেছে একটি অনির্বচনীয় কোমল প্রশান্তি।

মেজদা অবাক হয়ে গেল।

এলো কখন ও? এলো কেমন করে? কেনই বা এখানে ঘুমোতে এলো? কী মতলবে?

মেজদা আঙুলের চাপে আলোর বোতামটা টিপে কাঠ হয়ে বসে রইলো।

আলোক তরঙ্গ আঘাত করে বই কি! নীরবে আঘাত করে না মুখর হয়ে নির্মম আঘাত করে। বোধ হয় সেই আঘাতের তাড়নায় উসখুস করে চণ্ডী হঠাৎ উঠে বসলো।

বোতাম টেপা আঙুলটা মেজদার শিথিল হয়ে এলো ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

—মেজদা! আমি চণ্ডী। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

অন্ধকারেই মেজদা উত্তর দিল, আমি কানা নই। কিন্তু তুই এখানে কেন? এলি কেমন করে?

চণ্ডী বললে, তুই ঘর খুলে, আলো জেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। তাই আসতে পারলুম।

—আর আসতে যখন পারলি, তখন এইখানেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লি?

—বিষ্টি পড়ছিল তাই যাই যাই করেও যেতে পারিনি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

মেজদার গা জ্বলে উঠলো। সে কি বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করলো।

চণ্ডী বললে, দেশলাইটা দে, আলোটা জ্বালি।

মেজদা দেশলাইটা ছুড়ে দিল।

চণ্ডী হারিকেনটা জ্বাললে।

—ভোর হয়ে গেছে, না?

বুকের ওপর জড়ো করা কাপড়টা গায়ের উপর মেলে দিতে দিতে, সে মেজদার পানে চেয়ে মৃদু হাসলো। ঘুম জড়ানো চোখের মায়াভরা হাসি।

তারপর অপরাধীর মতো নিস্তেজ করুণ গলায় বললে, তুই রাগ করছিস মেজদা? অন্যায় করেছি?

—ন্যায় অন্যায় বোঝবার শক্তিটাই শুধু তোকে ভগবান দেননি। আর সব দিয়েছেন।

চণ্ডী এবার সশব্দে হেসে উঠলো। বাইরের বৃষ্টিধারার মত ধারালো সে হাসি। বুকে কাঁপন ধরায়।

চণ্ডী বললে, বোধশক্তি তো আমাকে দেননি। আমাকে কি দিয়েছেন আমার বিধাতা তাতো বললিনি?

মেজদা অকরুণ রুক্ষস্বরে বলে উঠলো, সেইটে আমার মুখ থেকে শুনতে পাসনি বলেই তোর যতো আক্ষেপ না? সবাই যে কথাটা বলে একা আমি বলিনা কেন?

—তোর বলবার তো অপেক্ষা রাখিনি আমি। সেই কথাটাই যে আমার ইষ্টমন্ত্র। আমার তপজপ।

—কী?

—বললে আবার তুই রাগ করবি।

—আমার রাগকে যদি তুই ভয় করতিস বা আমাকে এতোটুকু

সম্মান দিতিস তা হলে চোরের মত লুকিয়ে এসে আমার ঘরে ঘুমোতে পারতিস না। আমার ভাগ্যি ভালো যে আমার বিছানায় উঠে এসে আমার পাশে ঘুমোস নি?

চণ্ডীর মুখখানা পাংশু ও বিবর্ণ হয়ে গেল।

—আমার অন্যায় হয়েছে। আমি মাপ চাইছি।

চণ্ডীর দুচোখে অশ্রু টলমল করছে। দুজনে মুখোমুখি চেয়ে চুপ করে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে মেজদা জিজ্ঞেস করলে, চণ্ডী, তুই আমার কাছে তোর মনের কথা খুলে বল। আজ খোলাখুলি দুজনের একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আমাদের দুজনের নামকে এক কোরে বন্ধুমহলে হাসাহাসি কানাকানি করে। আমার ছোটদির কানে পর্যন্ত কথাটা উঠেছে।

চণ্ডী বিষন্ন ভগ্নস্বরে বললে, কেন করে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই।

—ন্যাকামি করিস নি চণ্ডি, কেন করবেনা তাই বল। রাত্রের অন্ধকারে বিষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেউ যদি তোকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে তারা কী ভাববে। তুই আসবি বলেই যেন আমি আলো জেলে দরজা খুলে বসেছিলুম।

চণ্ডীর ঠোঁট মুচড়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। অস্ফুট স্বরে গুঞ্জন তুললো, আমার সেই ভাগ্যি কিনা!

—তুই হাসছিস? আমার কান্না পাচ্ছে, আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আর তুই রঙ্গ করছিস? এই ভোরে কেউ যদি তোকে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে কি ভাববে? কোন সৎকাজে তুমি নিরিবিলিতে এমন সময় আমার ঘরে এসেছিলে?

চণ্ডী চোখ লুকোয়। একটু সরে বসে। বোধ হয় আড়াল খোঁজে। মুখ লুকোবার আড়াল।

মেজদা স্থিরপলক চোখে তার দিকে চেয়ে চুপ করে।

বড়ো শুষ্ক দেখায় চণ্ডীকে। যেন সুরপনের কলঙ্কের কালি মেখে মুখে নিশ্চল মূর্তির মতো বসে আছে।

বাইরে বৃষ্টির তোড় কমেছে।

ছাঁচতলার কচুবনে চাল থেকে ছাঁচ গড়িয়ে জল পড়ছে। কচুপাতার ওপর জলের টুপটাপ শব্দ একটা মোহময় রাগিণীর মতো কানে এসে ঝঙ্কার তুলছে।

মেজ-দার নিজেকে কেমন বেসুরো বেতালা মনে হলো।

চণ্ডীর মুখে চোখে কাঁচা ঘুমের ঘোর। চোখের ডালা দুটো ফুলো ফুলো। গাল দুটো ভরা ভরতি। রসে টসটসে। তীর্থ থেকে চণ্ডী অপরূপ স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরেছে। দেহের স্তবকে স্তবকে লাবণ্যের প্লাবন। শাড়ির আবরণ সে লালিত্যকে ঢেকে রাখতে পারছে না। সে সৌন্দর্যকে গোপন করতে পারছে না।

মেজদা নতুন চোখে চণ্ডীকে দেখছে।

হঠাৎ তার চণ্ডীকে ভালবাসতে ইচ্ছে হলো। সন্ত-ঘুম-ভাঙা মনটা বাদল হাওয়ায় ভিজে আবেশ মদির হয়ে উঠলো।

চণ্ডী কালো বড় বড় চোখের পাতাগুলো তুলে তারপানে মিটিমিটি চায়। দুজনে দৃষ্টির সজ্ঘর্ষ হয়। মেজদার চোখের অবিচল দৃষ্টি তাকে বিচলিত করে তোলে। তার নিঃসঙ্কোচ দেহকে সঙ্কুচিত করে তোলে। সে অগোছালো ভেবে বুকের আঁচলটা ধরে টানাটানি করে। নির্লজ্জ উদ্ধত বুকদুটোকে লজ্জালু করে তোলবার জন্য। পা দুমড়ে বসবার ভঙ্গিটাকেও ভদ্রও ভব্য করে তোলে।

লজ্জার মাঝে লাবণ্য আছে বই কি। চণ্ডীর এই ভঙ্গিটি করুণ

হয়ে মেজদার চোখে ধরা দিল। আনত বঙ্কতার ভঙ্গি। কোমল প্রতীক্ষার ভঙ্গি। তার মাঝে কাঁদছে একটি আশ্রয়ের স্নিগ্ধ নীড়। শরীরের শীর্ণ রেখায় কাঁপছে একটি সুনিবিড় পিপাসা। সে যেন অতীতকে অতিক্রম করে এই শীতল নিভৃতিতে এসেছে জীবনের প্রতিধ্বনি খুঁজতে। মেজদা তার মৌন কণ্ঠের অন্তরালে শুনতে পায় সেই আদিম শূন্যতার হাহাকার।

মেজদার মনের আকাশে ঝড়ের আভাস। ঈশানকোণে মেঘ জমছে। কামনার কালো মেঘ।

সে আচমকা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সরে গিয়ে খুলে দিল বাড়ির ভিতরের দিকের দক্ষিণের একটা জানালা। জানলা দিয়ে ভোরের আকাশের পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। বৃষ্টি ধরে গেছে।

চণ্ডী উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকল, মেজদা! আমি যাই।

মেজদা মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো। ধরা গলায় বললে, যা। আর কখনো আসিস না।

চণ্ডী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। হঠাৎ তার চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

মেজদা ধরা গলায় বললে, আমি জানি রে চণ্ডী, আমাকে তুই জাগাতে আসিস। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে তুই জাগাবি কেমন করে?

—না মেজদা আমি তোকে জাগাতে আসি না। জাগাতে এসে কি নিজে কেউ ঘুমিয়ে যায়? আর তোকে জাগিয়ে লাভ কি? শুধু চেয়ে থাকা বইতো নয়। ঘুমন্তকে দেখার বরং কোন ব্যাঘাত নেই। এ তো পৃথিবীর আকাশ দেখা। চাঁদ দেখা। মিলনের

তো খিদে নেই এর মাঝে। চোখভরে দেখা ছাড়া বাকিটা সবই বিচ্ছেদ।

—খিদে তোর নেই, আমার থাকতে পারে। লোভ তোর নেই আমার থাকা বিচিত্র নয়। তোর নিজের মনে জোর আছে। আমার না থাকতে পারে।

—না থাকবার তো কথা নয়। তুই পুরুষ, তুই বিদ্বান। তুই বড়ো ঘরে জন্মেছিস।

—সব মানি। কিন্তু রক্তটা যাবে কোথায়? রক্তের মাঝে যে আদিম পাপ মুখ লুকিয়ে আছে। তাকে ঠেকাবো কেমন করে? তাকে খুঁচিয়ে তুললে আর রক্ষে আছে? সে তো সুযোগ খুঁজছে বিপ্লব বাধাবার। সুযোগ দিলে আর তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

নিষ্প্রান, নির্বাপিত ভঙ্গিতে চণ্ডী তার মুখের পানে তাকালো।

মেজদা কাতর শুকনো গলায় বললে, নারে চণ্ডী, কোন উপায় নেই। এ শাস্তি আমাদের নিতেই হবে।

—কি? প্রশ্নাকুল চোখতুলে চণ্ডী তাকালো তার পানে।

—ড়ুজনের চির বিচ্ছেদ। তুই আমাকে দেখা দিবি না। আমিও তোকে দেখা দেবোনা।

চণ্ডী শিউরে উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলে। সে যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। তারপর ঘোলাটে চোখে মেজদার পানে চাইলো। হাসলো ও বুঝি মৃদু মৃদু। সে হাসিতে অনুচ্চারিত একটি বেদনা টলটল করছে।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, বেশ। তুই হুকুম করলে তাই হবে।

আবার একদৃষ্টে চণ্ডী তারপানে তাকালো। তার চোখে চোখ

রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দু'চোখ ভরে তাকে দেখলো. সে দেখার শেষ নেই। সে দেখার তৃপ্তি নেই। নয়ন না তিরপিত ভেল। চোখে জল। ঠোঁটে হাসি। ঘাড় বেঁকিয়ে রুদ্ধ স্বরে চণ্ডী বললে, আমি আসি।

মেজদার বাকরোধ হয়ে গেছে। পা মাটিতে বসে গেছে নড়বার শক্তি লোপ পেয়েছে।

ধীরপায়ে চণ্ডী ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় গেল। দাওয়া থেকে নামবার পথে থেমে আরেকবার পিছু ফিরে তাকাল। মেজদা দরজার বাজু চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দুহাতে চোখ ঢেকে চণ্ডী আর্তস্বরে বলে উঠলো, আমার চোখদুটো তুই কানা করে দিলি মেজদা!

* * *

চণ্ডী মেজদার কথা রেখেছে। মেজদার আদেশ ওর কাছে ঈশ্বরের আদেশ। সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেল কেউ জানে না। কেন গেল জানে তার অন্তর্যামী আর জানে মেজদা।

গাঁয়ের লোকে বলাবলি করে কোন মনের মানুষ জুটিয়ে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।

॥ বারো ॥

চণ্ডীর নিরুদ্দেশের সংবাদে কেষ্ট মর্মাহত হলো, কিন্তু সে আশা হারালো না। সে আশাবাদী। তার মনের দৃঢ়মূল বিশ্বাস যেখানেই থাক সে আবার ফিরে আসবে। অবধারিত আসবে সে মেজদাকে দেখতে। দেবতার মন্দির ছেড়ে ভক্ত যাবে কোথা? এ গাঁ তার তীর্থ। তীর্থে আসবেই সে একদিন।

ফটিকের মনেরও সেই ধারণা।

ভরসা করে মেজদাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না। মেজদাও আর গ্রামে আসেনা। সামনে তার পরীক্ষা।

গ্রামে এসে প্রথমেই কেষ্ট চণ্ডীর সঙ্গে আলাপ করেছিল। তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। চণ্ডীও তাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে তার চোখে প্রণয় কাজল এঁকে দিয়েছিল। তাই চণ্ডীর নিরুদ্দেশ তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল।

কী যে হলো, কে যে তাকে সর্বস্বান্ত করে দেশত্যাগী করে দিল, কেষ্ট ভেবে কুলকিনারা পায় না।

সহজে ভেঙ্গে পড়বার মেয়ে তো সে নয়। তার মনের কাঠামো শক্ত।

কেষ্টর কাছে কেমন বিসদৃশ ঠেকে। অস্বাভাবিক মনে হয়। এমন কি অঘটন ঘটতে পারে, যা চণ্ডীকে অকস্মাৎ বিবাগী করে দেবে। এ যেন চণ্ডীর মতো নয়। চণ্ডীর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না।

কেউ তাকে গুম্ করলে না তো?

সংশয় শঙ্কায় বিচলিত কেষ্টর মন।

সব চেয়ে বিস্ময়কর এর আকস্মিকতা। অস্বাভাবিক নীরবতা। আর কারুকে না জানালেও কেষ্টকে অন্তত সে জানিয়ে যেতো।

তাই কেষ্টর শঙ্কা হয়। তার মনে সংশয় জাগে। হয়তো এ স্বেচ্ছাকৃত নয়। এর পেছনে কোন অদৃশ্য হাত আছে। কোন শয়তানী চক্র আছে।

ফটিক জিজ্ঞেস করে, কাকে তোমার সন্দেহ? ঠাকুর্দাকে?

—আশ্চয্য নয়। অসম্ভব নয়।

—ও চণ্ডীর সঙ্গে মিছিমিছি শত্রুতা করবে কেন?

—কারণ তোমরা তার সব চেয়ে বড়ো শত্রু। তুমি, পান্নুদা আর গেঁদাফুল।

—তাই বুঝি? নিজেকে বাদ দিলে যে?

—আমার জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে শত্তুতা। তোমরাই যে আমার বল। আমার সহায়। তোমরাই যে আমাকে ঘিরে আছো।

ফটিক নিঃশব্দে হাসলো।

কেষ্ট শঙ্কিত বিবর্ণ মুখে তারপানে চাইলো।

ফটিক বললে, আমার কিন্তু মন বলে কেষ্ট, মেজদার সঙ্গেই চণ্ডীদির কোন কিছু ঘটেছে—

কেষ্ট বিস্মিত নয়নে তারপানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কি মনে হয় মেজদাকে সে জয় করে নিয়ে তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

—দূর! তা কেন? মেজদাকে জয় করবে চণ্ডীদি? পাগল! তা নয়। হয়তো খুব জোর ধাক্কা খেয়েছে তার কাছে। এবং সেই দুঃখ্যে—

—তা হতে প ে

কেষ্টর বুকের অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হলো।

তার ব্যথিত মুখের পানে চেয়ে ফটিকের বুকের নিচে খচ খচ করে একটা কাঁটা বিঁধতে লাগল। কেষ্ট যেন সুখি নয়। সদাই সে যেন শঙ্কিত, আড়ষ্ট আর অন্যমনস্ক। সবটাই তার শান্ত, কোমল আর নীরব। বাইরে মনে হবে হৃদয় তার এতদিনে প্রসন্ন আর প্রশান্ত হয়েছে। কিন্তু তবু সে নিরুদ্বেগ নয়। নিঃশঙ্ক নয়। নিশ্চিন্ত নয়। তবু কেন যে থেকে থেকে তার সুস্মিত মুখখানিতে বেদনার ছায়া ঘনায় সে বুঝে ওঠে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন একটা স্বপ্ন। এমনি আবিষ্টের মতো শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যেন কিছুই তার অনুভূতি-গোচর নয়।

কোথায় গেল তার সেই উছলে উছলে হাসি, কোথায় ডুবে গেল তার লীলাচঞ্চল দেহের অস্থির ঢেউ। কোথায় গেল সেই বন্য কামনা।

বেশীদিনের কথা তো নয় যে ফটিক ভুলে যাবে। বিয়ের পূর্বে কেষ্ট যখন তার প্রণয়িনী ছিল, তখনকার কেষ্টর সঙ্গে যে এর কোন মিল নেই। সে কেষ্ট ছিল দুর্বার দুঃসাহসী। তার দৃষ্টি ছিল শুধু ফটিকের দিকে। আকর্ষণ, আসক্তি, অনুরাগ সবই ঐ একটি মানুষকে ঘিরে। তাকে পাবার জন্য সে জীবন পণ করেছিল। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম, কুৎসা কলঙ্ক কিছুরই ভয় ছিল না। বিয়ের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সে রাতারাতি বদলে গেল। কোথায় গেল তার কামনার সেই তীব্রতা। কোথায় গেল তার উন্মাদ আকুলতা।

সে যেন ধীর, নম্র, লজ্জাশীলা কুলবধূ বনে গেল। সব বিশেষত্ব মুছে ফেলে প্রগলভ প্রণয়িনী হলো নির্বাক-কুণ্ঠা পত্নী।

ফটিক বলে, কেষ্ট! তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়েছো, কিন্তু তুমি তো সুখি হতে পারলে না?

—সে কি গো? আমার চেয়ে সুখি কেউ আছে নাকি? আমার তো চাইবার আর কিছু নেই। আমি চেয়েছিলুম তোমার ভালোবাসা। তোমার ভালবাসায় আমার বুক ভরে দিয়েছো। ডুবিয়ে রেখেছো।

—তবে তুমি এমন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন? মুখ শুকিয়ে এমনি মনমরা হয়ে থাকো দেখলে মনে হবে যে মনে তোমার সুখ নেই।

—ছিঃ! ও কথা বলো না। ওগো, আমার এ ভাগ্যি হতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে। আমাকে সুখি করবার জন্যে তুমি যে কাণ্ডটা করলে সে কি আমি কোনদিন ভুলতে পারবো?

কৃতজ্ঞতায় কেষ্টর গলার স্বর আছন্ন হয়ে এলো। চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ফটিক তাকে কাছে টেনে নেয়। বুকের খুব কাছে। আস্তে আস্তে বলে, তোমার সেই হাসি, সেই গান, সেই আনন্দ গেল কোথা?

কেষ্ট লজ্জালু ভঙ্গিতে তার পানে চেয়ে বলে, সবই আছে গো। সবই তোমার জন্যে আছে।

ফটিক তার মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলে, মনে পড়ে কেষ্ট সেই পথম রাতের কথা?

—পড়ে বইকি! সেই তো আমাদের আসল বিয়ে।

ফটিক বলে, সে-রাতের সেই হাসি, সেই ভাব, সেই গান, যা আমাকে জলের তোড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই যে আমার কেষ্টর আসল রূপ। সেই রূপ, আমার সেই জীয়ন্ত কেষ্টকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। সে রূপ লুকিয়ো না, সে আলো নিবিয়ে দিয়ো না আমার চোখের সামনে থেকে।

কেষ্ট ছলছল চোখে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে অঝোরে কাঁদে।

কেষ্টর মনের অস্বস্তি তো নিজের জন্য নয়। ফটিকের জন্য।

ভক্ত এখানে থাকতে সে কিছুতেই ফটিকের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ভক্তকে কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সে এমনি হিংস্র দৃষ্টিতে ফটিকের পানে তাকায় কেষ্টর বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

ফটিক যতোই নিস্পরোয়া হোক কেষ্ট মন থেকে কিছুতেই ভয়ের ভাবটাকে তাড়াতে পারে না। ফটিক যতোক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ সে মনের মাঝে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কিছুতেই মনে স্বস্তি পায় না। পায়না স্বচ্ছতা।

অথচ এই লোককে কেষ্ট একদিন লেত্তি জড়িয়ে লাট্টু ঘুরিয়েছে। সেই যে তাকে হিংস্র করে তুলেছে। ভক্তর সম্বন্ধে তার মনের স্পর্শবোধ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। অত্যন্ত অবিশ্বাস্য।

ভক্তর গতিবিধি ও অত্যন্ত সন্দেহজনক। সে যে কোথায় থাকে কি করে কেউ জানেনা। নতুন ঘরের চাবিটা তার কাছে আছে। কোনদিন রাত্রে বাড়ি ফেরে কোনদিন ফেরে না। সব দিন গাঁয়ে দেখা যায় না। সব ছেড়ে ছুড়ে দলিল লেখাপড়া করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফটিক তাকে অগ্রিম কিছু টাকাও দিয়েছে। তবুও সে ছল ছুঁতো করে কালহরণ করছে। কেন সেই জানে।

কেষ্টর সংশয় তাই শ্রাবণ মেঘের মত ঘন হয়ে ওঠে। সংশয়ের

চাপে সে ঘুমোতে পারে না। রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গণনা করে।

কেষ্ট ভক্তর ত্রিসীমানায় যায় না।

ভক্তকে কিন্তু সে ক'দিন চঁদে পুকুরের পাড়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। আড়াল থেকে তার লুব্ধদৃষ্টি দেখে সে শিউরে উঠেছে।

কেষ্ট এসে ফটিককে বলে।

ফটিক কৌতুক করে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, তাইতো ও যেতে পারছে না। তোমাকে দেখবার লোভ ছাড়তে পারছে না।

কেষ্ট মুখ বেঁকিয়ে বলে, অনেক দেখেছে। দেখে দেখে চোখে ছানি পড়েছে। ওর দিষ্টির বিষে আমার দেহ জরজর। তুমি ওকে যেমন করে পারো দিষ্টির বার করো।

ফটিক হাসতে হাসতে বলে, আমার বউ-এর রূপ দেখে যদি ওর চোখের তিপ্তি হয় দেখুক না। ওর চোখ জ্বলে যাবে। তোমার রূপ আগুনের মতো জ্বলে ওঠে ওর চোখ ঝলসে দেবে।

ধারার শ্রাবণ।

দিনে বৃষ্টি রাতে বৃষ্টি।

অশ্রান্ত বৃষ্টি। আকাশ মেঘে ঢাকা। অস্পষ্ট বিদ্যুৎ-চমক। দূর মেঘের গুরু গুরু গর্জন। দিনকে আর দিন বলে মনে হয় না। দিনের আলো ভালো করে ফুটতে না ফুটতেই আবার অন্ধকার হয়ে আসে। সারাক্ষণই অস্পষ্ট গোধূলি। ঘোলাটে আর ঝাপসা।

পুকুর, খানা ডোবা সব জলে ভরে গেছে। পথে জল। বাড়ির উঠোনে জল। পোড়ো ডাঙাগুলো জলে থৈ থৈ করছে। পাশের পানা পুকুরের পানাগুলো জলের তোড়ে ডাঙায় এসে উঠেছে।

নালা ভেঙে জল ছুটেছে। মাছ ভেসে এসেছে পুকুর থেকে। নালার মুখে আড়া পেতেছে মাছ ধরবার জন্যে। বৃষ্টিতে ভিজে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে।

ভিজে স্যাঁতসেতে দিন। ভিজে হাওয়া। ভিজে ঘরের দেয়াল, চাল। ভিজে গাছপালা। গাছের মাথায় ভিজে কাক। আর সব পাখি-পকালি কোথায় যে উধাও হয়েছে কে জানে।

আকাশের কোলে পাখি ওড়েনা। উড়ে চলেছে শুধু মেঘ আর মেঘ। স্তূপীভূত মেঘ। বিচিত্র রঙের বিচিত্র আকারের মেঘের রথ শূন্যপথে উড়ে চলেছে, নদী নালা, পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল পেরিয়ে কোন দূর দূরান্তরে। দেশ দেশান্তরে।

দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেষ্ট আকাশে মেঘের লীলা দেখে। মেঘের সঙ্গে তার মন ছুটে যায় শায়ে পুকুরের মাঠে যেখানে অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে ফটিক মুনিষের সঙ্গে কাজ করছে। ফটিক এখন সারাদিনই মাঠে থাকে। মাঠে তার জলখাবার যায়। শুধু দুপুরে একবার ভাত খেতে বাড়ি আসে।

বর্ষণ-মুখর ঝাপসা আকাশের নিচে কর্মরত ফটিক তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কতো কষ্টের জীবন! কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম।

দীর্ঘশ্বাসে কেষ্টর বুকের পাঁজরাগুলো দুলে ওঠে। সে যদি পারতো সাঁওতাল কামিনীদের মতো তার পাশে দাঁড়িয়ে মাঠের কাজ করতে।

হঠাৎ তার চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় একান্ত আত্মসমর্পণ করেও, সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেকে ফটিকের কাছে উৎসর্গ করে দিয়েও যেন সে ফটিককে সম্পূর্ণ সুখি করতে পারেনি। পারেনি নিজে সার্থক হতে। কোথায় যেন ফাঁক

থেকে গেছে। কিসের যেন একটা নিরেট ছায়া তাদের আড়াল করে দাঁড়ায়।

কেষ্ট বর্ষাসজল দূর আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবে। তার কালো শূন্য চোখে কিসের যেন একটা রক্তাক্ত ক্ষত।

তার মনে হয় সে পারেনি। সে ব্যর্থ হয়েছে। ফটিকের জীবনের ও ভালোবাসার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েও সে তাকে সুখি করতে পারছে না। এখনো তার প্রেমের জন্য কিছু একটা করা উচিত। এমন কিছু যাতে তার স্বাধীন সত্বা বিলুপ্ত করে দিয়ে নিমজ্জিত হয়ে যায় তার প্রেমের গভীরে। নিজে সে বাঁচতে চায় না। তার ভালোবাসাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ফটিকের প্রেমের অতলে। ডাঙ্গার গাছের মতো মাথা চাড়া দিয়ে পৃথিবীকে সে দেখতে চায় না। সে শ্যাওলার মতো, জলগুল্মের মতো ফটিকের প্রেমের তলায় আন্দোলিত হতে চায়। ফটিকের প্রেমকে স্বচ্ছ করে তুলতে চায়।

সময়ের অনুভূতি নেই। কে জানে কতো বেলা হলো। মাঠে জলখাবার পাঠাতে হবে।

কেষ্ট একটা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে ছপ ছপ করে উঠোনের জল ভাঙতে ভাঙতে রান্নাঘরে যায়।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে রাশীকৃত মাছ দিয়ে গেল। আড়ায় ধরা মাছ।

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, আমরা দু-মানুষ আর কতো মাছ খাবো ?

—মাছ ছাড়া আর এখন খাবি কি বউ। পোস্ত পেঁয়াজ আর মাছ, এই তো বর্ষার খোরাক গো।

ফটিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কেষ্টর আর কোন চিন্তা নেই।

সে নিজেকে ক্ষয় করে তদ্গত হয়ে ফটিককে সুখি করতে চায়। এই বর্ষাবাদল ফটিকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে।

অধিকাংশ চাষী সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যায় একটু আধটু মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। ফটিক খায়না। কেষ্ট জানে সে তাকে সমীহ করে। তাকে না বলে কোন শখ মেটাতে চায় না। তাকে বাদ দিয়ে কোন শখই তার নেই।

সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরে এলেই, কেষ্ট নিজের হাতে তার গা মুছিয়ে দেবে। গরম জলে গামছা ভিজিয়ে সেঁক দেওয়ার মত করে ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দেবে। শুকনো গায়ে একটা খারে কাচা গেঞ্জি পরিয়ে দেবে। নিজের হাতে মাথার চুল আঁচড়ে দেবে।

এ তার প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান।

ফটিক হাসতে হাসতে তাকে আদর করে বলে, পাগল।

—পাগল তো তুমিই করলে।

হাসতে হাসতে কেষ্ট তার চোখে চোখ রেখে বলে, এই পাগলামি নিয়েই যেন মরতে পারি।

ফটিক মুখখানা উঁচু করে বলে, একটা চুমু দিয়ে যাও।

কেষ্ট ফটিকের কম্পিত ঠোঁটের ওপর একটি চুমু খেলে। ফটিক অনুভব করলে সে চুম্বনে কেমন একটা ভয়কম্পিত উত্তেজনা। সে যেন অত্যন্ত ক্লান্ত।

রান্না ঘরের দাওয়ায় গিয়ে ফটিক বসলো। উনুনে জল ফুটছে।

কেষ্ট চা তৈরি করতে করতে হাসিমুখে বললে, তোমার জন্যে একটা জিনিষ আনিয়েছি। গরম চায়ের সঙ্গে খানিকটা খাও।

কেষ্ট চায়ের গ্লাসের সঙ্গে একটা কালো পাঁইট দিল।

ফটিক অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, এ আবার কি? এ কোথা পেলে?

কেষ্ট হাসতে হাসতে বললে, কুসমী এনে দিয়েছে ওদের পাড়া থেকে। তোমার নেশা করবার জন্যে আনাইনি। বেশী খেয়োনা যেন। গা গতরের টাটানি মরবে। শরীর ভালো থাকবে বলে আনিয়েছি।

—তুমি কি করে জানলে এতে শরীর ভাল থাকে?

তেরছা চোখে বিদ্যুৎ হেনে কেষ্ট বললে, আমি খাই যে। আমি মাতাল।

ফটিক হাসতে হাসতে বললে, তুমি মাতাল নও। তুমি মদ। খাঁটি নিজ্জলা মদ।

দুপুরের পর হঠাৎ ভক্ত বাড়িতে এসে হাজির। কেষ্ট খাওয়া দাওয়া শেষ করে দাওয়ায় বসে পান সাজছিল।

কদিন পরে বৃষ্টিটা ধরেছে। মেঘ কাটেনি। এখুনি হয়তো আবার নেমে আসবে অশ্রান্ত বর্ষণ।

খামার পেরিয়ে ভক্তকে আসতে দেখেই কেষ্ট আঁতকে উঠলো। কিন্তু সে ভয়ের ভাবটা চেপে মুখে একটা কাঠিন্য ফুটিয়ে তার পানে নিঃশব্দে তাকাল।

ভক্ত সোজা এসে দাওয়ার পাশে দাঁড়াল। কেষ্টকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ভক্ত কোমল কণ্ঠে বললে, আমি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তাই—

ভক্ত থেমে তারপানে চেয়ে মৃদু হাসল।

কেষ্ট মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করলে, তাই কি?

—তাই তোমার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতে এলুম।

ভক্তর লুব্ধ চোখে একটা ঝাপসা তৃষ্ণা।

কেষ্ট রুক্ষ তিক্তস্বরে বললে, বেশ। দেখা হয়েছে তো?

ভক্ত হাসতে হাসতে দাওয়ার ওপর আঁট হয়ে বসলো। কেষ্ট বিস্মিত চোখে তারপানে মুহূর্ত তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নিল।

ভক্তর মুখে খোঁচা খোঁচা একমুখ সাদা দাড়ি। চোখ দুটো জ্বলছে বেড়ালের চোখের মত। এককালের পোষা বেড়াল বিতাড়িত হয়েও কোনরকমে বাড়িতে ঢুকতে পেয়ে যেমনভাবে প্রভুর পানে তাকায়, ভক্তর চোখের চাউনিটা অনেকটা সেই ধরণের। মোটা নাক কুঁচকে হাসিটাও বেড়ালের আকিঞ্চন ভরা হাসির মত।

ভক্ত হাতবাড়িয়ে কোমল আর করুণ কণ্ঠে বললে, পান সাজছো। একটা দেবে? অনেকদিন তোমার হাতের পান খাইনি।

কেষ্ট মুখ ঘুরিয়ে বললে, না খাওয়াই ভালো। বিষ দিতেও তো পারি।

ভক্ত তারপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে ভরা গলায় বললে, তা দিলে তো বাঁচতুম কেষ্টকলি। এ যাতনার চেয়ে বিষের যাতনা কি বেশী?

কেষ্ট তার কথার জবাব দিল না। মুখ নিচু করে সে সঙ্কুচিত হাতে দুটো পান তার দিকে ঠেলে দিল।

কেষ্টর এই তুষ্ণীভাব বোধ হয় ভক্তর সাহস বাড়িয়ে দিল। তার হয়তো মনে হলো কেষ্ট তাকে অভয় দিল। সে পানদুটো মুখে পুরে নিজের বুকে একটা শিরাময় হাত রেখে বললে, আমার এই বুকের দাম কি তোমার ফটিকের বুকের চেয়ে কিছু কম? তোমার কি মনে হয় আমার হিদয় নেই? না সে হিদয়ে বেথা বেদনা বাজে না?

নিরুপায় হয়েই কেষ্টকে কথাগুলো শুনতে হলো। তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে তার ঘৃণা হলো। ফটিককে হয়তো এখুনি অভিশাপ দেবে। ফটিককে অকথা কুকথা বলবে। তার বুকের ভেতরটা দুর দুর করতে লাগল। এ যেন অদৃষ্টের অদৃশ্য লোক থেকে একটা অমঙ্গল সঙ্কেত।

ভক্ত পান চিবোনো লাল দাঁত বের করে বললে, ফটকে শুধু আমাকেই বোকা বানায়নি, তোমাকেও রীতিমত বোকা বানিয়েছে।

কেষ্ট শূন্যদৃষ্টিতে দূরপানে চেয়ে বললে, কেমন করে?

—নয়তো কি, এ একটা বিয়ে নাকি? তুমিও ঝোঁকের মাথায় একটা পাগলামি করে বসলে। এর জন্যে ভবিষ্যতে আপশোষ করতে হবে তা বলে রাখছি।

কেষ্ট জ্বলে উঠলো। একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে সে রুক্ষস্বরে গর্জে উঠলো, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছো? ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবেনা।

কেষ্ট উঠে দাঁড়ালো। পিছল পায়ে সাপের মতো।

ভক্ত মন ভেজানো নম্র গলায় বললে, ছিঃ! ও কথা বলো না কেষ্টকলি। তোমায় আমি ভয় দেখাবো? যারা তোমার ওপর অন্যায় করেছে—

—তুমি ছাড়া আর আমার ওপর কেউ কোন অন্যায় করেনি। গাঁয়ের সবাই আমায় কোল দিয়েছে। তুমি শুধু আমার ওপর অন্যায় করোনি, জানোয়ারের মতো জঘন্য অত্যাচার করেছো। মিথ্যে বলে, লোভ দেখিয়ে আমার কুমারী দেহটাকে অশুচি আর অশুদ্ধ করে দিয়েছো।

ভক্তর চোখদুটো জ্বলে উঠলো। সে মুখখানা বিকৃত করে ব্যঙ্গস্বরে বললে, আর সেই দেহটা নিয়েই তো বিয়ের এতো

ঘটা? সেই এঁটো দেহটা পেয়েই তোমার ফটিক চন্দরের এতো দেমাক!

সাপের মতো ফণা তুলে কেষ্ট গর্জে উঠল, তাকে বোঝবার চেষ্টা করো না। ছোটমুখে বড়ো কথা বলোনা। তুমি মানুষ কিনা জানিনা। তুমি যদি মানুষ হও সে দেবতা। আর সে যদি মানুষ হয় তুমি পিশাচ।

সশব্দে হেসে উঠলো ভক্ত। বুক কাঁপানো পৈশাচিক হাসি। হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধ আক্রোশে ভক্ত বললে, সেই পিশাচের ছেলেকে গভ্যে ঢুকিয়ে বিয়ের মন্তর পড়ে বউ হলে। তাকেও কি ফটকের ছেলে বলেই চালিয়ে দেবে?

কেষ্টর মুখখানা আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। সে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, না। সে নজ্জা থেকে ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন। সে পাপ পেটে নিয়ে, কেষ্ট বেঁচে থাকতো না। তাকেও বাঁচতে দিতো না। বেরিয়ে যাও, তুমি বাড়ি থেকে। নইলে চেঁচিয়ে নোক জড়ো করে অপমান করতে করতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দোব।

—ইস্।

কেষ্টর মুখের পানে চেয়ে ফটিক অবাক হয়ে গেল। একটা ত্বপুরে যে মানুষের চেহারা এমন বদলে যেতে পারে সে কল্পনা করতেও পারে না। কেষ্ট অসম্ভব রকম শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখখানা মোমের মতো ফ্যাকাশে আর বিবর্ণ। রক্তের অবশেষ নেই। চোখ ত্বটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে। ফুলো ফুলো চোখের কোলে কালি লেপে দিয়েছে। সমস্ত চেহারাটা অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খল আর ভীতিকর। ঝড়ের নির্মম দাপটে যেন অসহায়

পাখি নীড় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে নিরেট মাটিতে। ভয়াতুর দৃষ্টিতে তার নিরাশ্বাস অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

ফটিক তাকে বুকে টেনে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে দুপুরের ঘটনাটা জেনে নিল। কেষ্ট ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো, আমরা এখান থেকে চলে যাই চলো। ওর ভাবগতিক ভালো নয়। ও এখান থেকে যাবে না।

ফটিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, এতো বেস্তো হবার কোন কারণ নেই কেষ্ট। আমি মনীন্দর খুড়োর কাছে যাচ্ছি আর দেখে আসি ও শুয়োরের বাচ্ছা কোথায় আছে। এ বাড়িতে ঢোকা ওর আমি এখুনি বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি দুভাবনা করো না।

কেষ্ট নীরবে আচ্ছন্নের মতো ফটিকের হাতদুটি চেপে ধরে বসে রইলো। যেন তার মাঝ থেকে সে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করছে।

উজ্জ্বল উৎসাহদীপ্ত চোখে ফটিক বললে, ওকে তুমি এতো ভয় করো কেষ্ট ?

—এখন ও যে আর মানুষ নেই। আর ভয় তো আমার জন্যে নয়। আমার ভয় শুধু তোমার জন্যে। তুমি যে সারাদিন বাইরে থাকো। তোমার ওপর ওর সব চেয়ে বেশী আক্রোশ।

ফটিক হাসল। বললে, আমার কী করবে ও ? আমার জন্যে তোমার কোন ভয়ভাবনা নেই। তুমি অমন মুখ শুকিয়ে থেকো না। যাও, খেতে দাও।

নিবিড় নিশ্ছিদ্র তামসী রাত্রি। ঘরের মাঝে জমাট বাঁধা অন্ধকার। বাইরে অর্ধস্ফুট জগতের ক্ষীণ একটু চাঞ্চল্য। অন্ধকার যেন তার শ্বাসরোধ করে দিয়েছে।

ফটিক ঘুমিয়েছে। কেষ্ট তার ঘুমন্ত বুকের ওপর একখানা হাত রেখে নিস্পন্দের মতো পাশে শুয়ে আছে। যেন তাকে হাতের বেড় দিয়ে আগলে আছে।

চোখে তার ঘুম নেই। সে ঘুমোবে না। ফটিককে ঘুম পাড়িয়ে সারারাত জেগে সে তাকে পাহারা দেবে। সে শ্রান্ত। সারাদিনের ক্লান্তির ঘুমে সে অচেতন। আবার সকালে উঠেই তাকে মাঠে যেতে হবে।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে কেষ্ট। ফটিকের শিথিল কোমল নধর গায়ে আরামের উত্তাপ। উত্তাপে তার তরুণ রক্ত গলে যায়।

এতো নিবিড় সান্নিধ্য তবু যেন সে বিচ্ছিন্ন। তার ভেতরটা যেন শূন্য খোলার মতো একেবারে খালি। মনে হয় এই ঘুমন্ত জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কোন যোগ নেই। প্রতিদিনের জীবন থেকে সে কোন অজানা জগতে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে তার অনস্তিত্বের শুভ্রতায়। তার ফেরবার আর উপায় নেই। সমস্ত হৃদয় তার একটা নিদারুণ ভয়ে শিউরে ওঠে। একটা আতঙ্কময় বিভীষিকা,—তারই সঙ্গে ভক্তর প্রতি একটা দুর্নিবার ঘৃণা বিদ্যুৎ-চকিত রাত্রির মতো তার মনকে আলোড়িত করে তোলে। চালের নিচে থেকে কে যেন একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তার চোখ দুটো হিংস্র বন্যজন্তুর চোখের মত জ্বলছে।

কেষ্ট ফটিকের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বোঁজে। চোখ বুঁজতেই ভক্তর মুখ মনে পড়ে। অপরিসীম ঘৃণায় তার গা রী রী করে। সে বোঁজা চোখের ওপর আঙুল বুলিয়ে নেয়। তারপর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আলতো হাতদিয়ে ফটিককে সে আঁকড়ে ধরে।

তার মনে হয় আবার সে জীবনে ফিরে এলো। এতোক্ষণ

যেন সে জীবনের বাইরে চলে গিয়েছিল। জেগে জেগে এতোক্ষণ সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

থেকে থেকে বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝরোকার ফাঁক দিয়ে নীলাভ ঝলকানি এসে বিছানায় ছড়িয়ে পড়ছে। কেষ্ট সেই দিকে চেয়ে থাকে।

বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

বাইরে খস খস শব্দ হয়। কেষ্ট ভয়-চকিত দৃষ্টিতে দরজার পানে তাকায়।

হয়তো দাওয়ায় কোন কুকুর উঠেছে।

কেষ্ট রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

আবার শব্দ হয়। মানুষের পায়ের শব্দ। ভারি পায়ের চাপা শব্দ। পা টিপে টিপে কেউ চলাফেরা করছে মনে হলো। কখনো জানলার কিনারে। কখনো দাওয়ার নিচে।

পরিচিত পদশব্দ মনে হলো !

কেষ্ট উঠে বসলো। চোখ বড়ো বড়ো করে সে অন্ধকারে তাকাল।

পাশ ফিরে ফটিক ঘুমোচ্ছে।

তাকে কেড়ে নিতে এসেছে তার বুক থেকে।

দস্যু ঘোরাঘুরি করছে। সুযোগ খুঁজছে।

তার চিৎকার করে ফটিককে ডাকতে ইচ্ছে হলো।

না। তা হলে ফটিককে সে বাঁচাতে পারবে না। ওকে সামনে যেতে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিছুই তার কাছে এখন বড়ো নয়। ফটিক ছাড়া কিছুই নয়। না কিছুই নয়। নিজের প্রাণ দিয়েও সে ফটিককে নিরাপদ দেখতে চায়।

তার কাছে আর সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। ফটিক ছাড়া তার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই। কিছু নেই।

সব ছিল। সব ছেড়েছে। সব ভুলেছে।

জীবনে একমাত্র সত্য তার ফটিক। আর সব মিথ্যে হয়ে গেছে। মিথ্যের পেছনে ছুটোছুটি করে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে সে সত্যের সীমানায় এসে পৌঁচেছে।

এইবার আশ্চর্যরকম দ্রুতগতিতে সে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সে একটা নতুনত্বের স্বাদ পাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ফটিকের গায়ে তার পা লাগল। সে নিচু হয়ে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। ফটিক জানতে পারলে না।

আবার সেই খসখসানি।

রাত্রির স্তব্ধতা ঘুলিয়ে একটা পেঁচা তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো।

পেঁচা ডাকল কি? না নিশির ডাক। রাতের ডাক। কেষ্টর নিয়তির ডাক।

কেষ্ট আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। পা টিপে টিপে। তেমনি আস্তে আস্তে চেপে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

না। তার পা কাঁপেনি। বুক কাঁপেনি। সে নিঃশঙ্ক।

সে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখল। অন্ধকারে দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। সামনে অন্ধকার। আশেপাশে নিরন্ধ্র অন্ধকার।

সমস্ত আকাশ সাদা করে একটা বিদ্যুৎ চমকালো। মুহূর্তের জন্য নীলাভ তীব্র আলোয় ঘুমন্ত গ্রামটা তার চোখের সামনে ধরা দিল। তারপর আবার সব অন্ধকারে ডুব দিল। গাছগুলো সব